একমেবাদ্বিতীয়ং

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

একবিংশ কল্প

চতুর্থ ভাগ

১৮৪৮ শক

কলিকাতা

৫৫নং আপার চিৎপুর রোড্

আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩৩৩। খৃঃ ১৯২৭। সম্বৎ ১৯৮৩। কলিগতাব্দ ৫০২৭।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

একবিংশকল্প, চতুর্থ ভাগ।

১৮৪৮ শক, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৭।

বর্ণানুক্রমিক বিষয়-সূচী।

চিত্র-সূচী।

বিলম্বের কৈফিয়ৎ।

কলিকাতার সাম্প্রদায়িক ভীষণ দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে আমাদের যন্ত্রালয়ের অধিকাংশ কর্ম্মচারী দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকায় এবার পত্রিকা প্রকাশে অযথা বিলম্ব ঘটিল। আশা করি, সহৃদয় গ্রাহক ও পাঠকগণ আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন। ইতি—

বিনীত

শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ

কর্ম্মাধ্যক্ষ।



৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

একমেবাদ্বিতীয়ং

একবিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
বৈশাখ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৭।

৯৯৩ সংখ্যা ১৮৪৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিগতাব্দ ৫০২৭। সম্বৎ ১৯৮৩। খৃঃ ১৯২৬। শক ১৮৪৮। সাল ১৩৩৩।

বন্ধু আমার !

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১। বন্ধু আমার !

বন্ধু আমার ! প্রিয় আমার ! আমার প্রাণের ভিতর তোমাকে বন্ধু বলিয়া ডাকিতে কি তীব্র আকাংক্ষা জাগিতেছে, তাহা তুমি জানিতেছ। এ পর্য্যন্ত তোমাকে প্রাণ খুলিয়া বন্ধু বলিয়া ডাকিতে পারি নাই বলিয়া প্রাণের ভিতর কি প্রকার মর্ম্মভেদী আঘাত পাইতেছি, তাহাও তুমি জানিতেছ। এতদিন তোমাকে বন্ধু বলিয়া ধরি নাই, তাই সমস্ত জীবনটাই যেন মরুভূমি হইয়া উঠিয়াছে—চারিদিকেই শুষ্ক বালুকা ধূ—ধূ করিতেছে। একটী বৃক্ষ দেখিতেছি না, যাহার তলে মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্রাম লাভ করিতে পারি। আমার কর্ম্মফলের বীজসকল ইতস্তত নিক্ষিপ্ত হইয়া শতবিধ আগাছার জন্মদান করিয়াছে। এদিকে ওদিকে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছি—যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখিতেছি—কোথাও একটী সঙ্গী দেখিতেছি না। না—বন্ধু—না—আমি আর কোনও সঙ্গীর প্রত্যাশা করি না; কোনও ছায়াপ্রদ বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সুখ সোয়াস্তি লাভেরও আশা করি না। আমি তোমাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি—জানিয়াছি। তুমি যদি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাও, তোমার চরণতলে যদি আমাকে আশ্রয় প্রদান না কর, তবে তোমার স্পর্শে স্পন্দিত এই সুবিশাল সুবিমল আকাশতলে এই মরুভূমির বালুকারচিত সুকোমল চিতাশয্যায় শুইয়া আমার প্রাণ বহির্গত হৌক, তাহাতেও আমি সুখী। কিন্তু—না—জানি বন্ধু ! জানি বন্ধু ! তুমি আমাকে এত ভালবাস যে, তুমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমাকে পরিত্যাগ করিতে পার না। তুমি আমার নিত্যসঙ্গী থাকিয়া আমাকে তোমার গৃহপানে লইয়া চলিয়াছ। বন্ধু আমার ! এই সুনিস্তব্ধ সুপ্রশস্ত সুপ্রশান্ত মরুভূমির মাঝে দাঁড়াইয়া একবার আমাকে চীৎকার করিয়া তারস্বরে তোমাকে বন্ধু আমার—বন্ধু আমার বলিয়া ডাকিতে দাও—আমার প্রাণটা একটু হাল্কা হোক। আর সেই ডাকার প্রতিধ্বনি শুভ্র গগনের পরতে পরতে উঠিয়া চন্দ্রসূর্য্যকে স্পন্দিত করুক; গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে ঘুরিয়া ফিরিয়া সমগ্র দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষে সেই আহ্বানের তরঙ্গ জাগাইয়া তুলুক। আমার এই দুইটী ক্ষুদ্র হাত তোমার চরণের অভিমুখে বাড়াইয়া দিতেছি; তুমি আমাকে তোমার কোলে তুলিয়া এই সংসার হইতে অন্তর্হিত করিয়া ফেল—আমি একমাত্র তোমারই মুখের দিকে তাকাইয়া সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা জুড়াই।

২। লুকোচুরি।

বন্ধু আমার ! সহসা আমার নিকট হইতে তুমি লুকাইলে কেন ? তুমি কিন্তু চিরকাল লুকাইয়া থাকিতে পারিবে না। আমি তোমাকে নিশ্চয়ই

ধরিব—তুমি আমার নিকটে ধরা না দিয়া থাকিতে পারিবে না। তুমি লুকাইয়াছ, কিন্তু তুমি তোমার চরণপাতের চিহ্ন তো মুছিয়া ফেলিতে পার নাই। যেখানেই যাই, যে দিকেই চাই, তোমারই পদচিহ্ন দেখি। আমি তোমার সেই পদচিহ্ন ধরিয়াই তোমাকে নিশ্চয়ই ধরিব। আমার সঙ্গে এ প্রকার লুকোচুরি খেলা খেলিয়া তোমারই বা লাভ কি? তুমি কি দেখিতে চাও, তোমার জন্য আমার প্রাণ কতটা আকুল-ব্যাকুল হয়? দেখ তবে আসিয়া—তোমার অদর্শনে আমার প্রাণের ভিতর কি প্রকার ব্যথা জাগিয়াছে, সমস্ত হৃদয় কি প্রকার দুরুদুরু কাঁপিতেছে। এই গাছপালা, এই পূর্ণিমার চাঁদের সঙ্গে সাদাসাদা ভাসা-মেঘের খেলা—চোখের সম্মুখে এ সমস্ত যেন স্বপ্নের মত চলিয়াছে। এমন মধুর সময়ে বন্ধুকে পার্শ্বে না দেখিয়া কান্না যে হৃদয় ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে। এসো বন্ধু—এসো, তুমি নিজে আমার কাছে আসিয়া বসো। আমি হার মানিতেছি—আমি তোমার চরণচিহ্ন ধরিয়া কতই অগ্রসর হইয়াছি, তবু তোমাকে দেখিতে পাইলাম না। তুমি নিজে ধরা না দিলে আমি তোমাকে ধরিতে পারিব না, তাহা বুঝিয়াছি। এই স্থানটীও যেমন সুন্দর, এই কালটীও তেমনই সুন্দর। বন্ধু! আমার হৃদয়-আসনখানিও বিচিত্রগন্ধ বিচিত্রবর্ণ শতবিধ ফুলপত্রে খুব সুন্দর সাজে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছি। বাতাস ফুলের সুগন্ধভার বহন করিয়া শ্রান্তক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বন্ধু আমার—আর তুমি লুকাইয়া থাকিও না। আমি হার মানিয়াছি। আমাকে আর ব্যাকুল করিও না। একবার আমাকে দেখা দাও, আর এই সুসজ্জিত আসনে আসিয়া বোসো—আমার প্রাণ শীতল হৌক। তুমি যদি আমার সঙ্গে কতকদূর অগ্রসর হইয়া এই ভাবে সহসা অদৃশ্যই হইবে, তবে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাইয়া আমার হৃদয়কে অধিকার করিবার কি দরকার ছিল? তুমি যখন আমার কাছে ছিলে, তখন তো আমি নির্ভয় ছিলাম। এখন তোমাকে কাছে দেখিতে পাইতেছি না বলিয়া, এসমস্তই যেন মায়া বলিয়া মনে হইতেছে—মনে হইতেছে, যেন কোন্ মায়াপুরীতে আসিয়া পড়িয়াছি—এখানকার কোন কিছুই যেন সত্য নয়, কোন কিছুরই উপর যেন নির্ভর করিতে পারিতেছি না। আমার প্রাণের ভিতর যে আনন্দের হাসি উঠিতেছে, বা কান্নার ঢেউ উঠিতেছে—তোমার বিরহে এসমস্তই যেন মিথ্যা মরীচিকা বলিয়া মনে হইতেছে। বন্ধু! বন্ধু!—আমি তোমাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া আমার হৃদয়টাকে লইয়া খেলা করিও না। আমার চিত্তকমলকে পদদলিত করিও না, আমার চিত্তপ্রসূনের পাতাগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিও না।

৩। বিরহে।

বন্ধু আমার! এখন পর্য্যন্ত তো তুমি দেখা দিলে না। আমি তোমার জন্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া এ কোন্ অন্ধকার স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি! তুমি আমার পার্শ্বে বসিয়া থাকিবে; আর আমি তোমার বন্ধুত্ব একা-একা পূর্ণরূপে উপভোগ করিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা কতদূর সফল হইবে জানি না। আমি এখানে তোমার জন্য আকুল পরাণে ঘুরিয়া মরিতেছি, আর তুমি না জানি কোথায়—কোন্ অন্তরালে বসিয়া আমার এই ব্যাকুলতা দেখিয়া সুখ অনুভব করিতেছ! আমার নিকট ইহা তো বন্ধুত্বের উপযুক্ত কাজ বলিয়া মনে হয় না। অন্তরালেই যদি থাকিবে, তবে আমার দিকে বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া আমার প্রাণটাকে উদাস করিলে কেন? আমার কে-ই বা কোথায়! আমি লজ্জাসরম সমস্ত ত্যাগ করিয়া দুঃখদৈন্যকে বরণ করিয়া, তুমি ডাকিবামাত্র সমস্ত ছাড়িয়া একমাত্র তোমারই সঙ্গ লইয়াছি। এখন তুমিও আমার চক্ষের অন্তরালে থাকিলে আমি বাঁচি কি প্রকারে? নিতান্তই যদি তুমি না আইস, তবে দেখ—এই ধূলিধূসর মাটিতে তুমি যে পদচিহ্ন রাখিয়াছ, তোমার বন্ধু আজ সেই পদচিহ্নই বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া এই মাটিতেই পড়িয়া থাকিবে। তাহাতেই যদি তুমি সুখ পাও তো পাইও। আমি এইখানে বসিলাম—আমি আর তোমার পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইতে পারি না। আমি তোমার কাছে হার মানিলাম।

৪। দর্শনে।

বন্ধু আমার—বন্ধু আমার! তুমি একই কাছে

ছিলে যে, আমি ব্যাকুলচিত্তে ডাকিতে না ডাকিতেই তুমি এখানে আসিয়া উপস্থিত। আমি তোমাকে দিশাহারা হইয়া পাগলের মত খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম, আমার সেই কষ্টই দেখিতে কি তোমার এত ভাল লাগিতেছিল? আমি হার না মানিলে বুঝি তুমি ধরা দিতে না? তুমি আসিয়াছ, তাই আমার আনন্দ মনের ভিতর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না—আনন্দটা যেন মূর্ত্তিমান হইয়া তোমার সম্মুখে প্রকাশ হইতে চাহিতেছে। এই আনন্দের কাছে—পৃথিবীর সুখ!—কত তুচ্ছ, তাহা না বলাই ভাল।

বন্ধু গো! তুমি যদি আসিয়াছ তো এইখানে একটুখানি বোসো, আর আমাকেও তোমার কাছে একটুখানি বসিতে দাও। আমি তোমাকে খুঁজিতে খুঁজিতে অনেক কাঁটার বন ভেদ করিয়াছি বটে, কিন্তু তবু কি জানি কেন, আমার মন আমাকে সমস্তক্ষণই বলিতেছিল যে, তুমি আমার কাছে কাছেই আছ। তুমি কাছে ছিলে বলিয়াই বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে কেমন-যেন-এক সুগন্ধ পাইতেছিলাম। চাঁদের জ্যোৎস্না, ফুলের হাসি সকলের ভিতর দিয়াই মনে হইতেছিল, তুমিই যেন উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছিলে। পাখীদের নীরব কূজনের ভিতরেও যেন তোমারই অনাহত বাণীর আহ্বান শুনিতে পাইতেছিলাম। যাক—এখন দ্যুলোক ও ভূলোকের সর্ব্বত্রই তোমাকে পাইয়াছি। আমার প্রাণ যাহা চায়, তুমিই তাহাই। তোমার মত এজগতে আমার আর কেহই নাই। তুমি আমার দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাক, আমিও তোমার দিকে অনিমেষ নয়নেই চাহিয়া থাকি। ইচ্ছা হয়, এই ভাবেই সমস্ত রাতটাই কাটাইয়া দিই।

প্রিয় আমার! সত্যই তুমি আমাকে ভালবাস কি না এক একবার আমার জানিতে ইচ্ছা হয়। তোমার হৃদয়ে যদি আমি এতটুকু স্থান পাই—তবে তো আর কিছুই চাই না। তোমাকে দেখিয়াও হৃদয় আনন্দের আনন্দে ভরিয়া যায়; আবার তোমার বিরহেও দুঃখের আনন্দ, ব্যথার আনন্দ হৃদয়ে উদ্বেলিত হইয়া উঠে—এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! সত্যসত্য আমার ইচ্ছা কি হয়, তোমাকে কেমন করিয়া জানাইব? ইচ্ছা হয়—সমস্ত হৃদয়ের ভিতর তোমাকে টানিয়া রাখি—অনন্তকাল—অনন্তকাল ধরিয়া। এখন তোমাকে পাইয়াছি—আর তোমাকে ছাড়িব না। এখন আমার হাসি পাইতেছে—তুমি এইখানেই ছিলে, আমার এত কাছে ছিলে, তবু তোমাকে দেখিতে পাই নাই—তোমাকে খুঁজিয়া ঘুরিয়া মরিতেছিলাম। এসো বন্ধু,—এসো, আজ এই মধুর চাঁদিনী রাতে তোমার চরণ পূজা করিয়া তোমার সঙ্গে বন্ধুর সম্পর্ক গাঢ় ও দৃঢ় করিয়া লই।

গুরু ও শিষ্য।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবৎপ্রীতি ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

ভগবানকে সমস্ত হৃদয় দিয়া প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার একমাত্র উপাসনা, এবং এই প্রকার উপাসনাতেই আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। ইহাই হইল ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল মন্ত্র। সত্যধর্ম্মের ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় মূলমন্ত্র হইতে পারে না। এই মূলমন্ত্র প্রতি মানবের সহজাত সত্য। অন্তরে বা বাহিরে আমরা যাহা কিছু শিক্ষালাভ করি, তাহা এই সহজাত সত্যকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার চেষ্টা মাত্র। প্রতিজনের অন্তরে এই মূলমন্ত্রকে পরিস্ফুট করিয়া তোলাই মানবের শ্রেষ্ঠতম কার্য্য।

ভগবানকে সমস্ত হৃদয় দিয়া প্রীতি করিতে গেলেই তাঁহাকে জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে, তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই কারণেই উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন যে, যাহা দ্বারা সেই অবিনশ্বর পুরুষকে জানা যায়, সেই বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। আমাদের সকল বিষয়ে পরিমিত ভাবই আমাদের অন্তরে সেই অক্ষর অনন্ত পুরুষকে প্রকাশ করিতেছে। তিনি ইচ্ছাতে অনন্ত, জ্ঞানেতে অনন্ত, প্রীতিতে অনন্ত। তিনি একমাত্র অপ্রতিম পরমাত্মা; তাঁহার দ্বিতীয় কেহ নাই। তিনি যেমন বহির্জগতের বিধাতা, তেমনি তিনি অন্তর্জগতেরও নিয়ন্তা অন্তর্যামী পরম পুরুষ।

ব্রহ্মবিদ্যা শান্তির মূল।

নির্জ্জনে স্থিরচিত্তে আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, কি অন্তর্জগতে, কি বহির্জগতে, জগতে যাহা কিছু ঘটনা ঘটিতেছে; জ্ঞানবিজ্ঞানের যে কোন বিভাগে যাহা কিছু নবনব সত্য আবিষ্কৃত হইতেছে; ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সত্য তত্ত্বের সমর্থনে যে সকল নূতন নূতন প্রমাণ আবি-

ক্ষত ও সংগৃহীত হইতেছে—এ সমস্তই প্রকৃতপক্ষে এক একটী বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র নয়; এ সমস্তই পরস্পরের সহিত এক অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্রে সম্বন্ধ। তাই প্রকৃতির ঘটনাসমূহকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখিলে, সেগুলি কেন ঘটিল, তাহার কোনই কারণ খুঁজিয়া পাই না; সেগুলিকে ঐন্দ্রজালিক ঘটনা বলিয়া মনে হইবে—সেই সকল ঘটনার ভিতর হইতে হৃদয়ে কোনপ্রকার শান্তিলাভের আশা দেখি না। কিন্তু প্রকৃতির সমস্ত ঘটনাকে পরস্পর সম্বন্ধভাবে উপলব্ধি করিলেই সে সমস্তের ভিতরে আর ইন্দ্রজালের খেলা দেখিতে পাই না। তখন তাহার ভিতরে সকল কারণের কারণ মঙ্গলময় পরমেশ্বরের এক অবিচ্ছিন্ন প্রেমধারা প্রবাহিত দেখিয়া প্রাণের ভিতর মহাশান্তি লাভ করি। প্রাণের ভিতর শান্তির অভাব হইলে সমস্তই শূন্য মনে হয়। তাই যে ব্রহ্মবিদ্যা সকল জ্ঞান, সকল বিদ্যার ভিতরে মঙ্গলহস্ত প্রদর্শন করিয়া প্রাণেতে অপার শান্তি দিতে পারে, সেই ব্রহ্মবিদ্যাকে ঋষিদের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত আমরা সকলেই যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়া শিরোধার্য্য করিব, তাহা কিছু আশ্চর্য্য নয়। তাই ব্রাহ্মধর্ম্মে তেজস্বী মুণ্ডক ঋষির অগ্নন্ত বাক্যে বলিয়াছেন যে, "ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, এ সমুদয় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা; যাহা দ্বারা অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা"।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

ব্রহ্মজ্ঞান মানবের অন্তর্নিহিত সহজাত সত্য হইলেও তাহাকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির যত্ন ও পরিশ্রম আবশ্যক। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—বলহীন ব্যক্তি পরমাত্মাকে লাভ করিতে পারে না। অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞান নিহিত থাকিলেও তাহাকে পরিস্ফুট করিয়া তাহার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিতে চাহিলে বিশেষ ভাবে পরিশ্রম করিতে হইবে। নিমেষে নিমেষে হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি ক্ষুদ্র মলিন ভাবের সহিত সংগ্রাম করিয়া সেগুলিকে পরাজিত করিয়া হৃদয়কে পবিত্র রাখিতে হইবে, নির্ম্মল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ রাখিতে হইবে। ব্রহ্মপিপাসুমাত্রেই জানেন যে, ক্ষুদ্রতার সহিত, পাপের সহিত এই সংগ্রামে আমাদের শরীরসংস্থান বিষয়ক বল, আর মানসিক বল, সকল সংগ্রাম হইতে কিরূপ গুরুতর, কিরূপ প্রাণের সমস্ত বলপ্রয়োগের অপেক্ষা রাখে।

শ্রেয় ও প্রেয়।

পূর্ব্বকালে মহামনা ঋষিগণ এই আধ্যাত্মিক সংগ্রামের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মপিপাসুদিগকে উপযুক্ত গুরুর নিকটে গিয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিবার জন্য বারম্বার উপদেশ দিয়াছেন। আমরা যদি আত্মাকে পবিত্র রাখিয়া আত্মাতে ঈশ্বরের বাণী শুনিবার জন্য সচেষ্ট থাকি; যদি আত্মাতে তাঁহার অধিষ্ঠান দেখিবার জন্য উৎসুক থাকি, তবে আমরা সেই সত্যের সত্য পরমগুরুর নীরব উপদেশ অতি সহজেই শুনিতে পাই। কিন্তু আমরা অনেক সময়ে বিষয়সুখে এরূপ মত্ত থাকি যে, ভগবানের বাণীর প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য রাখি না। অনেক সময়ে ঈশ্বরের উপদেশ অন্তরে জলন্তভাবে শুনিতে পাইলে মোহবশত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাহার বিকৃতার্থ করিয়া তদনুসারেই কার্য্য করিয়া পরে অনুশোচনা করিতে বাধ্য হই। অনেক সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী অনুচর-সহচরদিগের পরামর্শে জানিয়া শুনিয়া ভগবানের আদেশের বিরুদ্ধে চলি, অথচ নানা তর্কজালে মনকে প্রবোধ দিতে যাই যে, ঈশ্বরেরই আদেশ অনুসরণ করিতেছি। একটী মিথ্যা কথার উপরে যখন প্রচুর বিষয়-বিভব মানমর্য্যাদা নির্ভর করে, তখন দেখা যায় যে, কত পরামর্শদাতা আসিয়া সেই মিথ্যা বলিবার জন্য আমাদিগকে কতপ্রকারে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করে। এই সময়ে অন্তরে শ্রেয় ও প্রেয়ের মধ্যে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ বাধিয়া যায়। তখন আমার গুরু শ্রেয়ের পথ প্রদর্শন করিয়া যথাযুক্ত যুক্তি সহকারে আমাকে শ্রেয়ের পথে পরিচালিত করিলে হৃদয় কিরূপ মহাবলে বলীয়ান হয়! এইরূপ সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান অবস্থায় বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায় বলিয়া ভগবানের সহিত প্রত্যক্ষ যোগসাধনের পথে অগ্রসর উপযুক্ত গুরুর সন্ধান লওয়াও যেমন আমাদের গুরুতর কর্ত্তব্য, সেইরূপ উপযুক্ত গুরুর সন্ধান পাওয়াও আমাদের পরম সৌভাগ্য।

ব্রহ্মজ্ঞান সহজ সত্য।

ব্রহ্মজ্ঞান যখন আমাদের আত্মাতে নিহিত ও সহজাত, তখন বলা বাহুল্য যে আত্মার সহজ জ্ঞানের দ্বারাই আমাদের তাহা উপলব্ধ হয়। চক্ষু-কর্ণকে যেমন দর্শন ও শ্রবণ করিতে শিক্ষা দেওয়া যায় না, সেইরূপ আত্মার সহজজ্ঞান, যাহার অপর নাম আত্মপ্রত্যয়, তাহাকেও আত্মার অন্তরে নিহিত স্বতঃসিদ্ধ সত্যসকল গ্রহণ করিবার বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না। এই সহজজ্ঞান আমাদিগকে বলিয়া দেয়, অর্থাৎ কূটতর্ক প্রভৃতির একটা অন্তরাল সম্মুখে উপস্থিত না করিলে আমরা সহজেই জানিতে পারি যে, আমাদের অন্তরে স্বাধীনতার একটা ভাব আছে। সহস্র তর্কবিতর্কের দ্বারা তাহা উড়াইয়া দিতে চাহিলেও আমাদের হৃদয় তাহা মানিতে চায় না এবং পারেও না। এই স্বাধীনতার ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সহজজ্ঞানেরই ভিতর দিয়া

আর একটী এই ভাব প্রাপ্ত হই যে, অন্তরে কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা বুঝিব তাহাই আমাদের করা উচিত।

ঈশ্বরই অভ্রান্ত গুরু।

এই স্বাধীনতার ভাব, এই কর্ত্তব্যজ্ঞান আমাদের হৃদয়ে কাহাকেও খুদিয়া বসাইয়া দিতে দেখি না। তবে ইহা আসিল কোথা হইতে? যাঁহা হইতে এই সকল অন্তর্নিহিত ভাব আমরা সংস্কারূপে পাইয়াছি, যিনি আমাদের অন্তরে এই সকল ভাব অহর্নিশি অনাহত ধ্বনিতে স্ফুরিত করিতেছেন, তিনিই একমাত্র অকিঞ্চন-গুরু, তিনিই একমাত্র আমাদের অভ্রান্ত গুরু। আমাদের লক্ষ্য হইতেছে সেই অক্ষর পুরুষকে, সেই অভ্রান্ত অকিঞ্চনগুরুকে উপলব্ধি করা, তাঁহার নীরব উপদেশ অনাহত বাণী অন্তরে প্রত্যক্ষ অনুভব করা।

গুরুর লক্ষণ।

ভগবানের সহিত প্রত্যক্ষ যোগসাধনের পথে অগ্রসর যে সাধক তাঁহাকে জানিবার পথ সুগম করিয়া দেন, তাঁহার বাণী শুনিবার সুচারু প্রণালী উদ্ঘাটিত করিয়া দেন; যিনি আমাদের স্বতঃপ্রাপ্ত সত্যকে জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে ব্যবহার করিতে এবং সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে সত্যের অধীন রাখিবার শিক্ষা দিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত গুরু হইবার উপযুক্ত। সহস্র গ্রন্থপাঠে যাহা না হইবে, তাহা এইরূপ গুরুর বাক্যে ও দৃষ্টান্তে হইবে। এরূপ গুরু হওয়া সাধারণ লোকের পক্ষে সহজ নয়। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এইরূপ গুরুর লক্ষণ বলিয়াছেন যে, তিনি শিষ্যের ভ্রম দূর করিতে সমর্থ হইবেন; তিনি শান্ত দান্ত ও দয়াদি গুণবিশিষ্ট হইবেন; বেদাদি বিদ্যা তাঁহার আয়ত্ত হইবে; তিনি সকল প্রকার ভোগে অনাসক্ত হইবেন; যাগযজ্ঞাদি বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ কর্ম্ম হইতে বিরত হইবেন; সদাচারী হইবেন; দম্ভ শঠতা প্রভৃতি দোষসকল পরিহার করিবেন; ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মে অবস্থিত হইবেন; এবং কেবল পরহিতৈষণা-প্রেরিত হইয়া বিদ্যাদান করিবেন। বর্ত্তমান যুগে কয়জন ব্যক্তিতে এই সকল গুণ একত্র দেখিতে পাওয়া যায়?

শিষ্যের লক্ষণ।

কেবল উপযুক্ত গুরুর সন্ধান পাইলেই যে ভগবানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসাধনের পথ শিষ্যের সম্মুখে খুলিয়া যায় তাহা নহে। শিষ্য স্বেচ্ছায় অজ্ঞাননিদ্রায় নিদ্রিত থাকিলে সহস্র গুরু কোনই সাহায্য করিতে পারেন না। শিষ্যের আন্তরিক যত্ন থাকিলে এবং তাহারই সঙ্গে উপযুক্ত গুরুর সহায়তা লাভ করিলে সিদ্ধিলাভে বিলম্ব ঘটে না। এই কারণে উপযুক্ত গুরুরও যেমন প্রয়োজন আছে, উপযুক্ত শিষ্যেরও সেইরূপ প্রয়োজন আছে। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মপিপাসু শিষ্যের লক্ষণ বলিয়াছেন—শিষ্য যাগযজ্ঞাদি বৃথা ক্রিয়াকর্ম্ম হইতে বিরত থাকিবে; পুত্র, বিত্ত ও প্রশংসার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিবে; শমদমাদি এবং শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য গুণযুক্ত হইবে; শুচি হইবে; যথাবিধি আচার্য্য সন্নিধানে আগমন করিবে এবং জাতি, কর্ম্ম, শীল, বিদ্যা ও কুল-বিষয়ে সুপরীক্ষিত হইবে। ব্রহ্মপিপাসু শিষ্য সর্ব্ববিধ ভোগসুখে অনাসক্ত হইয়া, সর্ব্বথা শুদ্ধ ও পবিত্র থাকিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে আচার্য্যসন্নিধানে আগমন করিবে, ইহাই হইল শাস্ত্রোক্ত বিধি। ইহা সত্য যে, গুরুর প্রতি শিষ্যের শ্রদ্ধাভক্তি না থাকিলে তাঁহার উপদেশ হৃদ্গত করিবার পক্ষে বিশেষ বাধা ঘটে। এই কারণে শাস্ত্রকারেরা শিষ্যের গুরুভক্তির প্রতি বিশেষ ঝোঁক দিয়াছেন। পূর্ব্বকালে শিষ্যগণ শুশ্রূষাদি দ্বারা গুরুভক্তি প্রকাশ করিত। তাই দেখি যে, মনু বলিয়াছেন—যে শিষ্যের অধ্যাপনাতে ধর্ম্ম বা অর্থ না থাকে, অথবা যাহার নিকট অনুরূপ শুশ্রূষা না পাওয়া যায়, উষর ক্ষেত্রে উত্তম বীজের ন্যায় তাদৃশ শিষ্যে বিদ্যাবীজ বপন করিবে না।

ধর্ম্মবিপ্লব ও স্বাধীনতাবিসর্জ্জন।

কি মনু, কি শঙ্করাচার্য্য, বিবিধ উপায়ে গুরুর প্রতি শিষ্যের ভক্তি-প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিলেও কেহই শিষ্যকে গুরুর উপদেশ বিনা বিচারে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা দেন নাই, গুরুর চরণে শিষ্যের মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিবার অনুশাসন প্রদান করেন নাই। কিন্তু অনুমান হয় যে, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক, বৌদ্ধ প্রভৃতি নানাবিধ ধর্ম্মের ঘাত-প্রতিঘাতে ভারতে যে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তাহারই সঙ্গে এদেশে যে সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবও আসিয়াছিল, তাহারই ফলে ভারতবাসীরা আর ধর্ম্মবিষয়ে বিশেষ চিন্তা করিবার অবসর পাইত না; তখন তাহারা অন্তর্নিহিত স্বাধীনভাবও সদ্ব্যবহারে বিরত হইল। সেই সময়ে কতকগুলি অসাধারণ মহাপুরুষের অতিমানুষ ক্ষমতা দেখিয়া জনসাধারণ তাঁহাদের চরণে নিজেদের বিচারশক্তি, স্বাধীনতা সমস্তই বিসর্জ্জন দিল। জনসাধারণের মন এতই বিক্ষিপ্ত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে, অন্তর্নিহিত স্বাধীনভাব সদ্ব্যবহার করিতে গেলে মনের যে একটুকুও সংযত বা প্রয়োগ করা আবশ্যক, তাহাও প্রয়োগ করিতে পরাঙ্মুখ হইল—সেই সকল মহাপুরুষদিগের কৃপার উপর নিজেদের পাপতাপ হইতে মুক্তিলাভের আশা রাখিয়া নিশ্চিন্ত বোধ করিতে চাহিল।

গুরুবাদ ও তাহার ফল।

এই প্রকারে গুরুভক্তি বর্দ্ধিত হইতে হইতে উপ-

যুক্ত সীমা ছাড়াইয়া ক্রমশ গুরুবাদে পরিণত হইল; ক্রমশ গুরুকে শিষ্য ভগবানের আসনে স্থাপন করিতে লাগিল। তখন এই ভাবের প্রবাদসকল প্রচারিত হইল যে, হরি রুষ্ট হইলে গুরু ত্রাণ করেন,কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে ত্রাণ করিবার কেহই নাই। এই প্রকার গুরুবাদের ফলে অনেক স্থলে গুরুবংশ জ্ঞান ও ধর্ম্মালোচনার সহিত সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিলেও বংশপরম্পরায় শিষ্য-বংশের গুরুর আসন অধিকার করে এবং আরাধ্য দেবতা ঈশ্বর অপেক্ষা অধিকতর পূজার্চ্চনা প্রাপ্ত হয় দেখা যায়। বলা বাহুল্য যে, মানুষের চরণে মানুষ হৃদয়ের সমস্ত স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিলে, তাহার অবশ্য-ম্ভাবী ফল অমঙ্গল—তাহার ফলে পরিণামে কখনই মঙ্গল হইতে পারে না। এইপ্রকার গুরুবাদ শিরোধার্য্য করিয়া স্বাধীনতা বিসর্জ্জনের ফলে আমাদের দেশের, সমাজের সর্ব্বাঙ্গ ব্যভিচার অনাচার কদাচার কিরূপ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেরই তাহা প্রত্যক্ষ হইবে। ভগবানের নিহিত স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিবার ফলে যে কি প্রকার অমঙ্গল প্রসূত হইতে পারে, বাউল, সহজী, গুরুদাসী প্রভৃতি সম্প্রদায় তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় দিতেছে; এবং ইহারই ফলে এদেশবাসী কপট সন্ন্যাসী প্রভৃতিরও চরণে সভয়ে অবনতমস্তক হইয়া নিজের শতবিধ অমঙ্গল আনয়ন করে। কেবল এদেশে নয়, যে দেশে এই প্রকার গুরুকে ঈশ্বর অপেক্ষা উচ্চ আসন দিয়া আত্মার স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে দেখা গিয়াছে, সেই দেশেই উহার ফলে অমঙ্গলের সৃষ্টি দেখা যায়। এই প্রকার গুরুবাদের ফলেই সেদিন রুষিয়ার সম্রাট-বংশকে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে। ঐ একই প্রকার শিক্ষার ফলে ইউরোপীয় মহাসমর সম্ভব হই-য়াছিল। আমাদের উপলব্ধিতেই আসে না, শিষ্য চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছে যে, তাহার গুরু যতই কেন উন্নত হউন না, তিনি তাহারই মত একজন মানব, তথাপি শিষ্য তাঁহাকে আরাধ্য দেবতা অপেক্ষা উচ্চ আসন প্রদান করিতে কিরূপে উদ্যত হয়!

ভগবানই একমাত্র অভ্রান্ত গুরু।

আমরা আশ্চর্য্য হই যে, গুরুবাদের ফলে, স্বাধী-নতা বিসর্জন দিবার ফলে প্রতিপদে অমঙ্গলের উৎপত্তি দেখিলেও আজ কয়েক বৎসর যাবৎ এদেশে গুরুবাদের একটা বাতাস প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে—প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ গুরুকে ঈশ্বরের আসনে বসাইয়া তাঁহাকেই সাক্ষাৎ ভগবান ও অভ্রান্ত গুরু বলিয়া ঘোষণা করিতে চান। কিন্তু তাঁহারা দেখেন না যে, কেহ অভ্রান্ত হইতে গেলেই তাঁহাকে পূর্ণপুরুষ হইতেই হইবে—একমাত্র পূর্ণ পুরুষেরই ভ্রমের অভাব হওয়া সম্ভব। অথচ পূর্ণ দুই জন হওয়াও অসম্ভব। সুতরাং এক পূর্ণপুরুষ ভগবান ব্যতীত আর সকলেই নিশ্চয়ই অপূর্ণ। সুতরাং মানুষ যখন অপূর্ণ, তখন তাহার ভ্রম থাক বা নাই থাক, ভ্রমের সম্ভাবনা যে আছে, তাহা তো অস্বীকার করা যায় না।

মনুষ্য পূর্ণপুরুষ হইতে পারে না।

আর, মনুষ্যকে কি প্রকারেই বা পূর্ণ বলা হয়, তাহাও আমরা বুঝিতে পারি না। মানুষ মাত্রই যে স্থানে ও কালে সীমাবদ্ধ—ঐখানেই তো তাহার অপূ-র্ণতা। এক বিষয়েও যাহার অপূর্ণতা, তাহাকে তো পূর্ণ বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। এবং ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, পূর্ণপুরুষ কখনই আপনাকে অপূর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে পারেন না। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান হইলেও তাঁহার পক্ষে কোন একটী মনুষ্যে তাঁহার পূর্ণসত্তায় অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব। অসম্ভব এই জন্য যে, পূর্ণ পুরুষ ঈশ্বর নিজের সত্তা ও স্বরূপ বিনষ্ট করিতে পারেন না। পূর্ণ ও অপূর্ণের মধ্যবর্ত্তী আর কিছুই নাই। যেমন এই জগতের একটীও পরমাণু সত্যসত্য বিনষ্ট হইলে সমস্ত বিশ্বচক্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, পূর্ণ পুরুষ অপূর্ণ হইতে চাহিলে তাঁহাকে নিজের স্বরূপ নিশ্চয়ই বিনষ্ট করিতে হইবে। পূর্ণ পুরুষ তাঁহার শতবিধ শক্তি মহাপুরুষদিগের ভিতর প্রেরণ করিয়া নিজের মঙ্গল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারেন; কিন্তু তিনি নিজ পূর্ণ সত্তায় অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিয়া স্থানে ও কালে সীমাবদ্ধ অপূর্ণ মানুষের মধ্যে কি প্রকারে অবতীর্ণ হইবেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য। যদিই বা তাহা সম্ভব হয়, সোনার পাথরবাটী যেমন আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি না, উহাও সেইরূপ আমাদের কল্পনারও অতীত। আর ইহাও তো বড় আশ্চর্য্য, যে সকল ব্যক্তি এই প্রকার মানবমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ তথাকথিত পূর্ণ পুরুষ ভগবানের সাক্ষাৎ পাইতেছেন, তাহার মুখনিঃসৃত বাণী প্রত্যক্ষ শুনিতেছেন, তাঁহাদেরও মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ মতভেদ আসে।

উপসংহার।

উপসংহারে আমরা খুব জোরের সহিত বলিতে চাই যে, উপযুক্ত গুরু ভগবানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ-সাধনের পথে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারেন। কিন্তু এমন গুরু নির্ব্বাচন করিতে হইবে, যিনি আত্মপ্রত্যয় বা সহজজ্ঞানের বিরুদ্ধে কোন উপদেশ দিবেন না। উপ-যুক্ত গুরু লাভ করিলে তাঁহার প্রতি যথাযুক্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে, ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার জন্য তাঁহার উপদেশ ও পরামর্শ প্রভৃতির সহায়তা নিশ্চয়ই

গ্রহণ করিবে; কিন্তু তাঁহাকে ঈশ্বরের আসনে বসাইয়া, তাঁহার চরণে আত্মার স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়া নিজের এবং দেশের ও সমাজের অমঙ্গল আনয়ন করিও না। আত্মার স্বাধীনতার মূল আত্মপ্রত্যয়কে সযত্নে পোষণ করিলে আত্মপ্রত্যয়ই সন্ধান দিবে, কে প্রকৃত গুরুর আসন অধিকার করিবার উপযুক্ত আর কে-ই বা অনুপযুক্ত।

প্রসাদী ফুল।

(রামপ্রসাদী সুর)

১। অভয়।

(মন) দেখরে চেয়ে কে জেগে আছে—
গগন ভুবন চিত্তকমল সকল ঠেঁয়ে সে যে আছে।
(ধুয়া

ঘুমিয়ে যবে র'বি সুখে,
ঘরের ভিতর র'বি ঢুকে—
ভুল না করে জানিস্ রে ঠিক্—মা তোর সদাই
গায়ের কাছে।
সুখের বন্যা আস্‌বে যবে,
দুখের ঘায়ে মরবি যবে—
চোখ খুলে তুই দেখ্‌লে মায়ের দেখ্‌বি রে হাত
সবের মাঝে।
মিছে ভয় তুই করিস নেকো,
তাঁ' হতে দূর্ ফিরিস নেকো—
শোন্ ওরে তুই প্রাণের মাঝে বিজয়ডঙ্কা
তাঁরি বাজে॥

২। বিষয়-বিষ।

(মন) বিষয়-বিষের কুপে ডুবলি কেন হায়।
কিবা হ'ল, কিবা হবে, তোর্ এত কি আসে বা যায়!
(ধুয়া)

ক্ষণে ক্ষণে মর্‌ছে লোকে,
বন্ধু যত মরে শোকে—
দেখেও রে তুই ভুলিস্ তবু—সঙ্গে এসব কিছু না যায়!
সংসার অসার সবাই বলে,
তা শুনে তো কেউ না ফেরে;
জেনেও রে তুই মরিস্ কেন ঘুরে ঘুরে ভবের খেলায়?
শমন-জয়ী হতে যদি চাস্,
কাটবি যদি ভবেরি পাশ,
পলক দেরী না করে আর পড়গে মায়ের চরণ-ছায়॥

৩। জন্ম ও মৃত্যু।

(মন) জনম নিলেই যখন মরণ আছে—
ডুবিস্ কেন বল্‌রে তবে, এত আশা দ্বন্দ্ব মাঝে? (ধুয়া)

সুঠাম তোর এই যে দেহ,
এই যে বাড়ী এই যে গেহ—
চক্ষু দুটী বুজ্‌লে পরে লাগবে এসব কিবা কাজে?
মন্ত্র নে রে এখনো ভেবে—
নামে রুচি দয়া জীবে;
দম্ভ তম ছেড়ে দিয়ে দাঁড়া মায়ের চরণ-পাশে ।
রোগ শোকে তো আকুল সবে,
(তবু) নাইকো মরণ সবার ভাবে;
তুইও কি তাই মরবি ভুলে—দেখ্‌বিনে মা আছেন কাছে?

৪। ভুল।

ভুল করে আর ঘুরিস্ নেকো (ধুয়া)।
এসেছিলি কষ্টে দুখে,
যেতে হবে কষ্টে দুখে;
পাগল হয়ে তুই সুখের আশে শুধু ঘুরে মরিস্ নেকো।
সাবধান রে দিচ্ছি কয়ে—
পরহিতে মন ঢেলে দেবে—
জননীর এই চরম আদেশ—প্রাণে তা কি শুনিস্ নেকো?
কথার ছলে ধনের বলে
এড়াতে চাস মরণকালে?
হবে নাকোতা—হবেনাকো—প্রাণের ভিতর ভেবে দেখো॥

৫। জননী।

মন্টারে কর্ খাঁটি সোনা।
ছয় রিপুরে বেড়াজালে বেঁধে আগুন লাগিয়ে দে না।
(ধুয়া)

জলে স্থলে শূন্যে যিনি,
আপন ধ্যানে থাকেন যিনি;—
মায়েরে সেই দেখি' চিতে সকল কথা ছেড়ে দে না।
আপন বলে ভাবিস্ কারে?—
থাকিস নে আর স্বপন-ঘোরে;
বন্ধু তিনি, তিনি মাতা—প্রাণভরে তাঁয় দেখে নে না!
মরণ কালে পালায় সবে
যেথায় আছে যে তোর ভবে।
ভবসিন্ধু পার হতে যদি চাস্, মায়ের পায়ে শরণ নে না॥

বারুণী।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

হিন্দুশাস্ত্রে বারুণীতে গঙ্গাস্নানের বিধি আছে। দেশদেশান্তর হইতে লোক আসিয়া বারুণীতে গঙ্গাস্নান করিয়া যায়। কোথা হইতে বারুণীর উৎপত্তি তাহা বলা বড় কঠিন। বারুণীতে গঙ্গাস্নান করিলে যথেষ্ট পুণ্য সঞ্চয় হয়, ইহা শাস্ত্রের উক্তি। তিথিতত্ত্বের

ভিতরে দেখি স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন স্কন্দপুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন—

বারুণেন সমাযুক্তা মধৌ কৃষ্ণা ত্রয়োদশী।
গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত সূর্য্যগ্রহ-শতৈঃ সমা॥

চৈত্র মাসে বারুণ অর্থাৎ শতভিষা নক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণা ত্রয়োদশী। ঐ তিথিতে গঙ্গাস্নান করিলে শত সূর্য্যগ্রহণে স্নানের সমান ফল হয়।

শনিবার-সমাযুক্তা সা মহাবারুণী স্মৃতা।
গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত কোটিসূর্য্য-গ্রহৈঃ সমা॥
শুভযোগ-সমাযুক্তা শনৌ শতভিষা যদি।
মহামহেতি বিখ্যাতা ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ॥

শনিবারে পড়িলে উহা মহাবারুণী বলিয়া পরিগণিত হয় এবং কোটি সূর্য্য গ্রহণে স্নানের তুল্য ফল হয়। উহা আবার পুণ্যযোগ সমাযুক্ত হইলে মহামহাবারুণী নামে ব্যাখ্যাত হয় এবং উহাতে স্নান করিলে শতকোটী কুল উদ্ধার প্রাপ্ত হয়।

বারুণীর গঙ্গাস্নানের সংকল্প এই—"ওং তৎসৎ অদ্য চৈত্রে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ অমুক-গোত্রঃ অমুক-দেবশর্ম্মা বহুশত-সূর্য্য-গ্রহণকালীন-গঙ্গাস্নান-জন্য-ফলসম-ফলপ্রাপ্তিকামঃ গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে"।

গঙ্গাস্নান মাত্রেই যে সত্য সত্য পাপ যায় না এবং সঙ্গে সঙ্গে ত্রিকোটি-কুলও উদ্ধারপ্রাপ্ত হয় না, তাহা জ্ঞানোন্নত ব্যক্তিকে বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু যাহারা অজ্ঞান, সমুন্নত জ্ঞানপ্রধান ধর্ম্ম আচরণে যাহারা নিতান্ত অনধিকারী, তাহাদের জন্য ধর্ম্মসাধনের পথ প্রমুক্ত রাখিলে জনসমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা একেবারেই ধর্ম্মহীন ও নাস্তিক হইয়া যাইবে হিন্দু শাস্ত্রকারগণের এরূপ ধারণা ছিল। তাহারই জন্য শাস্ত্রকারগণ ফলবহুল ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন; এবং এই ফললাভের লোভকে এতই বিবর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন যে লোকে যেন ব্যাকুলভাবে এই সমস্ত কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে।

এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, গঙ্গাস্নানকে কেন ধর্ম্মকার্য্য ধরা হয়? স্রোতের জলে স্নান শরীরের পক্ষে যে উপকারী তাহা বলা বাহুল্য। অধিকন্তু গোধনের ন্যায় এদেশে গঙ্গারও উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। তদ্ব্যতীত, দেশদেশান্তর হইতে অসংখ্য যাত্রী যখন গঙ্গাস্নানে আগমন করে, তাহাদের সঙ্গে শ্রদ্ধাভক্তিতে হৃদয়ের মিলনের ভিতরে অন্তরে যে এক অভিনব জাগরণ অনুভূত হয়, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাই ঈদৃশ অনুষ্ঠানে কেবল শরীর নহে—চিত্তও যে কতকটা উন্নত হয়, অন্তরে যে পবিত্রতার সঞ্চার হয়, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী মাত্রেই অবগত আছেন।

যাহারা গঙ্গাস্নান করিয়া উঠিল, তাহারা এই বোধ লইয়া গৃহে ফিরিল যে, তাহাদের সমস্ত পাপ স্খলিত হইয়া গিয়াছে—তাহাদের পিতৃপুরুষগণ উদ্ধারলাভ করিয়াছেন। অনধিকারীপক্ষে এইরূপ অনুভবের একটি মূল্য আছে। এইরূপ ফলকামনা-বহুল অনুষ্ঠান হিন্দুসমাজে আছে বলিয়া এদেশের নিম্নস্তরের নিরক্ষর হিন্দুগণ অন্যান্য দেশের অপেক্ষা ধর্ম্মভীরু ও শান্তস্বভাব ইহাই অনেকের ধারণা।

খৃষ্টসমাজের ভাব হইতেছে যে, সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে—'আমরা পাপী'। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ভিতরেও যথেষ্ট পরিমাণে এই পাপবোধের ভাব ছিল; ব্রাহ্মসমাজের ভিতরেও কতকটা ঐ ভাব বিরাজমান। হিন্দুসমাজের ভিতরেও ঐ ভাবের কথা আছে। নারায়ণের প্রণামের মন্ত্রে আছে—

পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপ-হরো ভব॥

অর্থাৎ আমি পাপী, আমি পাপকর্ম্মা, আমি পাপাত্মা, পাপ হইতে আমার উৎপত্তি। হে পাপনাশক পুণ্ডরীকাক্ষ, তুমি আমাকে সর্ব্বপাপ হইতে রক্ষা কর। হিন্দুধর্ম্মের এই ভাব যে খৃষ্টধর্ম্মে প্রবেশ করে নাই, তাহা কে বলিতে পারে?

এইরূপ মন্ত্র হিন্দুশাস্ত্রের ভিতরে থাকিলেও খৃষ্ট-সমাজের ভিতরে পাপবোধের মাত্রা যেরূপ সমধিক, হিন্দু-সমাজের ভিতরে সেরূপ নহে। হিন্দু-সমাজের ভিতরে এমন যথেষ্ট অনুষ্ঠান রহিয়াছে, যাহাতে লোকে আপনাকে নিষ্পাপ বলিয়া মনে করিবার অবসর পায়। গঙ্গাস্নান ও অন্যান্য পূজা-পদ্ধতি তাহার অন্যতর। খৃষ্টসমাজে গভীর পাপবোধের ভাব আছে, কিন্তু নিষ্পাপ-বোধের ভাব নিতান্ত বিরল। এদেশের শিক্ষার পরিসমাপ্তি আপনার নিষ্পাপ অনুভূতিতে। বেদান্তের ভিতরেও সেই শিক্ষাই পাই। পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত যখন ধ্যানযোগে মিলিয়াছি, তখন আমার পাপ কোথায়? আমার পাপ-তাপ সবই দূরে পলায়ন করিয়াছে; নিরবদ্য নিরঞ্জনের সহবাসে আমিও নিষ্পাপ হইয়া গিয়াছি। তাই পঞ্চদশীর তৃপ্তিদীপ প্রকরণের শেষ অংশে আছে—

অহো পুণ্যমহো পুণ্যং ফলিতং ফলিতং দৃঢ়ং।
অস্য পুণ্যস্য সম্পত্তেরহো বয়মহো বয়ং॥
অহো শাস্ত্রমহো শাস্ত্রমহো গুরুরহো গুরুঃ।
অহো জ্ঞানমহো জ্ঞানমহো সুখমহো সুখং॥

কি আশ্চর্য্য দৃঢ় পুণ্য-ফল আমার প্রীতিবৃক্ষে ফলিত হইয়াছে। আমার এ পুণ্য পরমাশ্চর্য্য, এই আশ্চর্য্য পুণ্যসম্পত্তি হেতু আমিও পরমাশ্চর্য্য। কি আশ্চর্য্য

শাস্ত্র, কি আশ্চর্য্য গুরু, কি আশ্চর্য্য জ্ঞান, কি আশ্চর্য্য সুখ, অহো আমি এক্ষণে লাভ করিয়াছি (বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের অনুবাদ)।

অনেকে বলেন, বারুণী-স্নান প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সার্থকতা আছে। তাঁহাদের মতে এই সকল অনুষ্ঠানের অনুবর্ত্তী হইয়া সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি অপরের সহিত তাহার তাদাত্ম্যবোধ অনুভব করে; জনসমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি উপলব্ধি করিতে পারে যে, আমাদের মধ্যে একই প্রথা একই আচার ও একই রীতি বিদ্যমান। আমরা সকলে একধর্ম্মী, এককর্ম্মী ও একই জাতি। এইরূপ বুঝিবার সুবিধা না ঘটিলে জনসমাজ সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে না। পরস্পরের মধ্যে ঐক্য অনুভব করিয়া প্রত্যেকে তৃপ্তিলাভ করে বলিয়াই জনসমাজ গঠনের সুবিধা হয়। অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়াই এই ঐক্য ফুটিয়া বাহির হয়। এইরূপ কতকগুলি অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া হিন্দু জাতির প্রত্যেকে পরস্পরের সঙ্গে ঐক্য অনুভব করে, অনুরূপ আচরণ দেখিয়া পরস্পর তৃপ্তিবোধ করে, মিলনের স্থান খুঁজিয়া পায়। এই সমস্ত আচরণ একই ধর্ম্মের অনুগত জনমণ্ডলীর ভিতরে ঘনিষ্ঠ মিলন আনিয়া দেয় এবং ঐ মিলন আঠার ন্যায় পরস্পরকে একত্র বাঁধিয়া রাখে। এদেশে আমাদের মস্তকের উপর দিয়া কত রাজনৈতিক বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু আচার ও রীতি-নীতির সমধিক আধিক্য থাকাতেই আমরা চূর্ণ হইয়া যাই নাই ইহাই অনেকের বিশ্বাস। ঐ সমস্তের 'বিধি-নিষেধ' শাস্ত্রের ভিতর স্থান পাইয়া হিন্দুসমাজকে বাঁচাইয়া আসিয়াছে। ইহার ফলে প্রকৃত ধর্ম্মের অন্তঃসার কতকটা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু মনে হয়, ঘোর দুর্দ্দিনের সময় এই সমস্ত 'বিধি-নিষেধ'ই এ জাতিকে অনেকটা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

এক সময়ে এই 'বিধিনিষেধই' বহুল অংশে প্রকৃত ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। আজকাল স্বাধীন চিন্তার ধারা আমাদিগকে জাগ্রত ও কতক পরিমাণে আহারবিহারাদি বিষয়ে অসংযত করিয়া তুলিয়াছে; সমাজের মধ্যে যে ঐক্যের ও মিলনের মধুর ভাব ছিল তাহাকে ধীরে ধীরে শিথিল করিয়া দিতেছে। আমরা ভাবে, চিন্তায়, বেশে পরস্পরকে সকল সময়ে একই সমাজের একই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া চিনিয়া উঠিতে পারিতেছি না—পরস্পরকে প্রেমালিঙ্গন দান করিতে পারিতেছি না। বংশানুগত জাতিভেদ যেমন একদিকে উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে, অপরদিকে অর্থ ও মানসম্ভ্রমজনিত অন্যবিধ জাতিভেদ মস্তক উত্তোলন করিবার ছিদ্র অনুসন্ধান করিতেছে।

আমাদের দেশে পূর্ব্বে যে সমস্ত রীতি-নীতি ছিল তাহা যে সর্ব্বাংশেই ভাল ছিল, তাহা আমরা স্বীকার করি না। অন্ধ রীতির ফলে নরবলি, সহমরণ, গঙ্গায় পুত্র-কন্যা-বিসর্জ্জন প্রভৃতি অনাচার হিন্দুসমাজকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল—ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম আচরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তান্ত্রিকগণের মধ্যে কৌলাচার উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি করিতেছিল। জ্ঞানের আলোকের—ব্যাপক শিক্ষার অভাবই তাহার প্রকৃত কারণ। এখন জ্ঞানের আলোচনা চারিদিকে বিস্তৃত ভাবে আরম্ভ হইয়াছে। যে সকল প্রাচীন রীতি—যাহাতে ধর্ম্মের অবমাননা না হয়, সেগুলি যথাসম্ভব রক্ষা করিতে পারিলে পরস্পরের মধ্যে আপেক্ষিক মধুর সম্বন্ধ রক্ষা পাইবে, এবং পারস্পরিক যোগ একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে না ইহাই অনেকে মনে করেন।

সমাজের নিম্নস্তরের সঙ্গে উচ্চস্তরের যোগ রাখিতে হইবে। সমুচ্চ ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার যাহাদের সামর্থ্য নাই, তাহারা যাহাতে নাস্তিক হইয়া না যায়, সে দিকে সমাজসেবক ও দেশসেবকের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ধর্ম্মের স্থূলভাবের মধ্যে যাহারা থাকিতে চায়, উচ্চস্তরের ধর্ম্ম যাহাদের আয়ত্তের বহির্ভূত, তাহাদিগকে উপহাস করিলে চলিবে না; ঘৃণার চক্ষে—অবজ্ঞার চক্ষে দেখিলে চলিবে না, কুসংস্কার বলিয়া উপহাসের সঙ্গে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। প্রকৃত ধর্ম্মের পথে তাহাদিগকে অগ্রসর করিতে চাহিলে সর্ব্বাগ্রে ব্যাপক শিক্ষার বিধান চাই, তবেই ক্ষেত্র প্রস্তুত হইবে, সংস্কারচেষ্টা আশানুরূপ ফলদান করিবে।

নববর্ষের উদ্বোধন।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্)

আজ নববর্ষের প্রারম্ভে নবীন করে আপনাকে জাগিয়ে তুলতে হবে—নব উৎসাহে নব আনন্দে ভগবানের পথে অগ্রসর হতে হবে—নব আয়োজনে তাঁকে হৃদয়দেউলে বরণ করে নিতে হবে—নব শক্তি নিয়ে 'মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা' মুছতে হবে—আত্মাকে পরমাত্মার প্রিয় আবাসস্থল করে তুলতে হবে। যিনি চিরনবীন, যিনি চিরসুন্দর, তাঁর রচিত সুন্দর পৃথিবীতে কোথাও যেন অসৌন্দর্য্য মলিনতা না থাকে, কোথাও যেন দ্বন্দ্ব বিচ্ছেদ বিরোধ নিরানন্দ না থাকে। অন্তর বাহির শুভ্র অমল হোক—ভায়ে ভায়ে মিলিত হোক বিশ্ববাসী—এই আমাদের তাঁর কাছে একান্ত প্রার্থনা। এমন সুন্দর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নিরানন্দ ম্লান হয়ে দিনযাপন করা আমাদের অন্যায়—আমাদের পাপের ফলভোগ সন্দেহ নাই। আমরা প্রত্যেকে অমৃতের

সন্তান—অমৃতত্বে আমাদের জন্মগত অধিকার—এ কথা আজ নূতন করে আমাদের জানতে হবে এবং জীবনকে সেইমত গঠিত করে তুলতে হবে। 'রাজপুত্র' আমরা যেন দাসত্ব করে জীবন অতিবাহিত না করি—যেন জীবনকে বিফল না করি। কর্ম্ম আমাদের কাছে আনন্দের কর্ম্ম হোক—আমাদের বন্ধন না হোক—জীবন আমাদের দুঃসহ ভারসম না হোক—আনন্দের নিকেতন হোক। আমাদের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কার্য্য, বাক্য ও আচরণ সুন্দর হোক—জগতের কল্যাণার্থে নিয়োজিত হোক—ভগবানের প্রিয় কার্য্য হোক। ক্ষুদ্রের মধ্যে তুচ্ছতার মধ্যে প্রেয়ের আহ্বানে বহুদিন আমরা ফিরেছি, কিন্তু সুখ পাইনি, শান্তি পাইনি, আজ সে কথা স্মরণ করবার দিন। আজ সমস্ত হৃদয়-মনকে দিয়ে বলাতে হবে—ভগবানেই আমার সুখ—ভগবানেই আমার শান্তি—ভগবানেই আমার প্রাণের আনন্দ—তাঁরই পথে তাঁরই পানে আমায় চলতে হবে—তাঁকেই জীবনে জানতে হবে—হৃদয়ে উপলব্ধি করতে হবে; তাঁকেই জীবনের কর্ণধার করতে হবে—তিনিই আমাদের জীবনের জীবন, প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা—তাঁর পথে অগ্রসর হওয়াতেই আমাদের পূর্ণ মঙ্গল, তাঁহার সহিত একান্ত মিলনের মধ্যেই আমাদের জীবনের পূর্ণতম সার্থকতা।

নববর্ষের প্রারম্ভে ভগবানকেই জীবনের কেন্দ্র করে রাখতে হবে, আমাদের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা ভগবৎমুখী করতে হবে। "আমাদের ধারণা, আমাদের অনুভূতি, আমাদের দর্শন, আমাদের আদর্শ হোক ভগবান;—আমাদের সাধনা, আমাদের কার্য্য, আমাদের জীবন হোক ভগবান; আমাদের হৃদয়, আমাদের আনন্দ, আমাদের অন্বেষণ সকলই ভগবানে ভরিয়া যাক—ভগবানই আমাদের জীবনস্বরূপ হউন। আমাদের জীবনের ষোল আনা ইচ্ছা ভগবানে নিয়ন্ত্রিত হোক—হৃদয়বুদ্ধির ষোল আনা আকর্ষণ ভগবানে নিয়মিত হোক।" পৃথিবীতে অনেকদিন হ'ল এসেছি—বেলা অনেক হয়েছে—সূর্য্যাস্ত হবার হয়তো আর বেশী বিলম্ব নেই—আর যেন আমরা ভ্রমান্ধ হয়ে না ফিরি—এইবেলা যেন 'ঘরের ঠিকানা' করে যেতে পারি।

তুচ্ছ অভিমান অহঙ্কার, ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়ে এস আজ আমরা ভগবানে উদ্বুদ্ধ হই। ভগবানে আত্মসমর্পণ করে নিজের ব'লে যেন আর কিছু রাখি নে—আমাদের আশা, আমাদের শক্তি, আমাদের বুদ্ধি, আমাদের প্রীতি ভক্তি সমস্তই ভগবানের দান। জগতে যা কিছু আছে সমস্তই ভগবানের—দেহ প্রাণ মন হইতে ধরণীর ধূলি তৃণ কীট পর্য্যন্ত ভগবানে পূর্ণ—কেহই ক্ষুদ্র নয়—কেহই তুচ্ছ নয়—এইটুকু যেন আজ মনে গেঁথে নিতে পারি—সকলকে হৃদয়ে বরণ করে নিতে পারি। আজ এস পূর্ব্ব, এস পশ্চিম, এস উত্তর, এস দক্ষিণ—আজ সকলকে আমরা নমস্কার করি—এস ব্রাহ্মণ, এস চণ্ডাল, এস বৃহৎ, এস ক্ষুদ্র, আজ সকলকে অভিবাদন করি। আজ এস তৃণ, এস কীট, এস পশু, এস পক্ষী আজ সকলকে অন্তরে বরণ করি। আজ ভগবান আমাদিগের মনের রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিন—তিনি আমাদের জাগ্রত করুন অসত্য হতে সত্যে, অন্ধকার হতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হতে অমৃতে। আজ এস আমরা সারা জীবনের পাথের ভিক্ষা করি ভগবানের নিকট—তিনি আমাদের পবিত্র ইচ্ছা পূর্ণ করুন।

শ্রীরামানুজ স্বামী।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

আমাদের দেশে যেমন শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম সাধন ও প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার বহু পূর্ব্বে মান্দ্রাজ অঞ্চলে সেইরূপ এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া আব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-পর্য্যন্ত বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই মহাপুরুষের নাম রামানুজাচারী বা রামানুজাচার্য্য। জীবিত অবস্থায় ই'হার ৭৪ জন বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন। এতদ্ভিন্ন ৭০০ সন্ন্যাসী, ১২০০০ একাঙ্গী, ৩০০ কোথী (স্ত্রীলোক) এবং বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণেতর জাতীয় ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা এই মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

রামানুজের জীবনী লিখিতে হইলে প্রথমে শ্রীশতকোপ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। শ্রীশতকোপ তেলী জেলায় শ্রীনগরী নামক কোন শূদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কারী এবং মাতার নাম নাথনায়কা ছিল। ইহারা সংসারসুখে বঞ্চিত না হইলেও অপুত্রক হেতু বড়ই দুঃখিত ছিলেন। এই জন্য তিরুকুরঙ্গী নামক স্থানে কুরুঙ্গেশ দেবের নিকট পুত্রার্থে বর প্রার্থনা করেন। ইহার কিছুদিন পরে শতকোপের জন্ম হয়। এ কারণ অনেকে বিশ্বাস করেন যে শ্রীকুরঙ্গেশ স্বয়ং কারী এবং নাথনায়কার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিশ্বাস সমর্থন করিবার জন্য ভক্তগণ ভবিষ্যৎ, ভার্গব, পদ্ম, বৃহৎপদ্ম, মার্কণ্ডেয় এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ হইতে শ্লোকসকল উদ্ধৃত করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, শতকোপ জন্মগ্রহণ করিয়া প্রায় ষোল বৎসর কাল মৌনাবলম্বন করিয়া কালযাপন করেন। ঐ সময় তিনি সর্ব্বদাই একটি তেঁতুল গাছের তলে

বসিয়া থাকিতেন। বৈষ্ণবগণ এই তেঁতুল গাছটিকে অনন্ত দেবের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। কথিত আছে যে, যেমন মহামতি ধ্রুব পঞ্চম বর্ষ বয়সে যোগসাধনা করিয়া ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বালক শঠকোপও তদ্রূপ সেই তেঁতুল গাছের তলায় অনাহারে ষোল বৎসর কাল সমাধিস্থ থাকিয়া পরব্রহ্ম লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শঠকোপ জন্মগ্রহণ করিবার অনেক দিন পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ গায়ক ভক্ত মথুরা কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বপ্রথমে শঠকোপের নিকট আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করেন বা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

শঠকোপ দেখিলেন যে ক্রমে সংস্কৃত ভাষা মৃতভাষায় পরিণত হইতেছে। সাধারণ লোকে, এমন কি, অনেক ব্রাহ্মণও তখন সংস্কৃতচর্চ্চা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং শাস্ত্রগ্রন্থাদি দেশীয় ভাষায় অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের প্রচলিত তামিল ভাষায় অনুবাদ না করিলে জীবগণের মঙ্গলসাধনের উপায় নাই। সে কারণ তিনি আব্রাহ্মণ-চণ্ডাল পর্য্যন্ত নরনারীগণের বোধগম্য করিবার জন্য শাস্ত্রগ্রন্থাদি সুললিত তামিল ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অল্প দিন মধ্যেই 'তিরুবিরতম্,' 'তিরুবশীর্য্যম্', 'পেরিয়া তিরুবওদী' এবং 'তিরুবৈমলী' নামক ঋক, যজু, অথর্ব্ব ও সামবেদের সংক্ষিপ্ত সার গ্রন্থসকল প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে শেষোক্ত গ্রন্থই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহাতে ১১০২টী শ্লোক আছে।

এইরূপে তিনি প্রায় ৩৫ বৎসর কাল তামিল ভাষায় নানাবিধ শাস্ত্রগ্রন্থাদি অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব জাগরিত করিয়া দিয়া জীবলীলা সংবরণ করেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর মথুরা কবি প্রায় ৫০ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। এই সময় তিনি নানা দেশ পর্য্যটনপূর্ব্বক শঠকোপ-বিরচিত ধর্ম্মসূত্রগুলি মধুর সঙ্গীত দ্বারা প্রচার করেন।

এই সময় হইতে দাক্ষিণাত্যের উপর দিয়া এক প্রবল ধর্ম্মের বন্যা বহিয়া যাইতেছিল। যে সকল মহাপুরুষ এই বন্যায় যোগদান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে যমুনাচার্য্যের নামই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যমুনাচার্য্য একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন।

শৈলপূর্ণ নামে যমুনাচার্য্যের এক শিষ্য ছিলেন। তাঁহার দুই ভগ্নী ছিল। তাহাদের নাম কান্তিমতী ও ধ্যান্তিমতী। আসুরী কেশব সমায়জীর সহিত কান্তিমতীর এবং কমলাক্ষ ভট্টের সহিত ধ্যান্তিমতীর বিবাহ হয়। কেশব সমায়জীর ঔরসে এবং কান্তিমতীর গর্ভে ৯৪০ শকে রামানুজ জন্মগ্রহণ করেন। ভক্তগণ তাঁহাকে লক্ষ্মণের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন।

রামানুজ অতি অল্প দিন মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। ১৬ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। ইহার কিছুদিন পরে রামানুজ সংবাদ পাইলেন যে কাঞ্চীনগরে যাদবপ্রকাশ নামক জনৈক সন্ন্যাসী বেদান্ত শিক্ষা দিতেছেন। তিনি এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রেই কাঞ্চীনগরে গমন করিয়া যাদবপ্রকাশের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন।

একদিবস যাদবপ্রকাশ তৈত্তিরীয় উপনিষদ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান কালে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" কথার ব্যাখ্যা করিবার সময় বলিয়া উঠিলেন, এই ঋষিবাক্য কখনই সত্য হইতে পারে না। ব্রহ্মকে সত্যং, জ্ঞানং এবং অনন্তং বলাও যা, আর একটি গাভীকে শৃঙ্গবতী, ভগ্নশৃঙ্গী ও শৃঙ্গবিহীন বলাও তাই। এই কথা শুনিয়া রামানুজ বলিলেন, গুরুদেব আমার নিকট সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মের অপর একটি সুন্দর ভাষ্য হইতে পারে। যথা সত্যং অর্থাৎ নিত্যং বা অপরিবর্ত্তনীয়, জ্ঞানং অচিৎশূন্য এবং অনন্তং অসীম, এই তিনটি বিভিন্ন গুণ হইলেও ব্রহ্মে অর্পণ করিতে পারা যায়। যাদবপ্রকাশ এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া নীরবে রহিলেন। অন্য একদিন ছান্দোগ্য উপনিষদের "কপ্যাসম্ পুণ্ডরীকম্" বাক্য লইয়া যাদবপ্রকাশের সহিত রামানুজের মতান্তর উপস্থিত হয়। ইহাতে যাদব অতিশয় অসন্তুষ্ট হয়েন এবং বাটী হইতে রামানুজকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

এই ঘটনার পর যাদব ভাবিলেন যে, তাঁহাকে রামানুজের হস্তে পুনঃ পুনঃ অবমানিত হইতে হইবে; সুতরাং তাহাকে নষ্ট করাই কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যে একদিন তিনি তাঁহার কতিপয় প্রিয় এবং বিশ্বাসী ছাত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎসগণ! এই রামানুজ একজন ভয়ানক ব্যক্তি। তোমরা কি দেখিতেছ না যে সে আমার ছাত্র হইয়া আমার সহিত তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হয়? তাহাকে আমাদের মধ্য হইতে বিদূরিত করিতে (অর্থাৎ মারিয়া ফেলিতে) না পারিলে ইহার দ্বারা অদ্বৈতবাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা। অতএব তোমরা যে কোন প্রকারেই হউক গোপনে এবং অতি সাবধানে এই ব্যক্তির বধসাধন কর।" ছাত্রগণ নানাবিধ উপায় নির্দ্দেশ করিলেন কিন্তু সকলগুলিই পাপকার্য্য বলিয়া যাদব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইল। তিনি বলিলেন, "এস আমরা তাহাকে লইয়া তীর্থযাত্রা উপলক্ষে বারাণসী গমন করি। তাহা হইলে তথায় রামানুজ নিশ্চয়ই গঙ্গাগর্ভে নিপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে। আমাদেরও বিনা পাপকার্য্য দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।"

এইরূপ পরামর্শ স্থির হইবার পর কয়েকজন ছাত্র

রামানুজকে যাদবের নিকট ডাকিয়া আনিলেন এবং যাদবও তাহাকে কৃত্রিম আনন্দের সহিত পুনর্গ্রহণ করিলেন।

কিছুদিন পরে একদিন যাদব শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—বৎসগণ! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। শীঘ্রই আমাকে ইহধাম পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমার একান্ত ইচ্ছা যে আমার শেষ জীবন গঙ্গাতীরে অতিবাহিত করি।

যেমন রামের সহিত লক্ষ্মণের নাম জড়িত, শ্রীকৃষ্ণের সহিত বলরামের নাম নিত্য সংযুক্ত, শ্রীচৈতন্যের নাম নিতাই ভিন্ন সম্পূর্ণ হয় না, সেইরূপ রামানুজের সহিত গোবিন্দের নাম একসূত্রে গ্রথিত। এই গোবিন্দ রামানুজের মাতৃস্বসা দ্যুতিমতীর পুত্র—সুতরাং সম্পর্কে রামানুজের ভ্রাতা। রামানুজ যখন বিদ্যাশিক্ষার জন্য কাঞ্চীনগরে যাদবপ্রকাশের নিকট আইসেন, তখন গোবিন্দও তাঁহার সহপাঠীরূপে তথায় আশ্রয় লাভ করেন।

যাদবপ্রকাশের প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া শিষ্যগণ সকলেই মহানন্দে তীর্থপর্য্যটন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। রামানুজ এবং গোবিন্দও তাঁহাদের সহযাত্রী হইলেন।

যখন সশিষ্য যাদবপ্রকাশ বিন্ধ্যাচলের পর্ব্বতরাজির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন গোবিন্দ তাঁহার তীর্থযাত্রার মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন। যাদবের কৃত্রিম স্নেহ ও শিষ্যগণের যত্ন দেখিয়া ভ্রাতা রামানুজের ভাবী অমঙ্গল চিন্তায় তিনি কাতর হইলেন। পরদিন অতি প্রত্যূষে যখন রামানুজ প্রাতঃকৃত্য সমাপনার্থ গভীর জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিলেন, গোবিন্দ তাঁহার পশ্চাদনুগমন পূর্ব্বক এক নিভৃত স্থানে যাইয়া রামানুজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ! আমার বোধ হইতেছে যে এই তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গ মধ্যে কোনও গূঢ় কারণ নিহিত আছে। আমার বিশ্বাস যাদবপ্রকাশ তোমার অসাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধি দেখিয়া তোমার উপর ঈর্ষাপরবশ হইয়া তোমাকে প্রবঞ্চনা করতঃ বারাণসীক্ষেত্রে লইয়া যাইতেছেন। তোমাকে বিনষ্ট করাই তাঁহার ও তাঁহার শিষ্যগণের মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহা হউক, তুমি আর ফিরিয়া যাইও না। এই স্থান হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা কর।" এই বলিয়া গোবিন্দ তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

রামানুজও সেই নিবিড় অরণ্য মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে বহুদূরে যাইয়া পড়িলেন। ক্রমে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া এক বৃক্ষতলে সংজ্ঞাহীন হইয়া নিপতিত হইলেন।

সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে পর তিনি দেখিলেন এক ব্যাধ ও ব্যাধপত্নী তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাদের দেখিবামাত্র তিনি গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কে? কোথা হইতে আসিতেছেন? এবং কোথায় যাইবেন?" ব্যাধ উত্তর করিল, আমরা বহুদূর হইতে—তুষারাবৃত হিমাচলস্থ সিদ্ধাশ্রম হইতে আসিতেছি এবং পবিত্র সত্যাব্রত (কাঞ্চী) নগরে গমন করিতেছি। রামানুজ বলিলেন,—"আমিও সেই স্থানে যাইব, কিন্তু আমি পথহারা হইয়া বিপন্ন হইয়াছি। আপনারা না আসিলে আমি অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া এই স্থানেই পড়িয়া থাকিতাম। আপনারা এক্ষণে আমাকে দয়া করিয়া এই বিজন অরণ্যের বাহিরে লইয়া চলুন।" ব্যাধ বলিল, "তবে আইস"। রামানুজ তাহাদের পশ্চাদনুগমন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা একটি পথ দেখিতে পাইলেন এবং সেই পথ দিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গমন করিয়া একস্থানে একটি বৃহৎ বৃক্ষতলে রাত্রিযাপনার্থ আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বলা বাহুল্য যে, সে দিবস তাঁহাদিগকে অনাহারেই থাকিতে হইয়াছিল।

প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে পর রামানুজ দেখিলেন যে, ব্যাধ ও ব্যাধপত্নী তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। তৎপরে কিয়দ্দূর গমন করিয়া তিনি কাঞ্চীনগরস্থিত বরদ দেবের মন্দিরের পুণ্য কোটী-বিমান দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহার মনে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হইল।

কথিত আছে, যে দিবস রামানুজ ব্যাধ ও ব্যাধপত্নী সহ বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন করিতে বাধ্য হয়েন, উক্ত দিবস মধ্য রাত্রে ব্যাধপত্নী অতিশয় পিপাসিত হইয়া তাঁহার স্বামীকে জল আনয়ন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। ব্যাধ বলিলেন, "হে সুভগে, এই গহন কানন মধ্যে এত অধিক রাত্রিতে আমি কোথা হইতে জল আনয়ন করিব। তুমি একটু অপেক্ষা কর, রাত্রি প্রভাত হইলেই আমি কোন কূপ হইতে স্বচ্ছ নির্ম্মল এবং শীতল বারি আনয়ন করিয়া তোমার পিপাসা শান্তি করিব।" এই কথা শুনিয়া রামানুজ ভাবিলেন, "হায়! আমি কি হতভাগ্য, এই স্থানের পথ-ঘাটে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতাবশতঃ আমি আমার উপকারী বন্ধুগণের এ সময় কোন উপকার করিতে পারিলাম না।"

যাহা হউক, রামানুজের বিশ্বাস হইয়াছিল যে সেই ব্যাধ ও ব্যাধপত্নী ছদ্মবেশী শ্রীরামচন্দ্র এবং তাঁহার পত্নী সীতাদেবী। তাঁহারা তাঁহার দুঃখে কাতর হইয়া তাঁহাকে মহারণ্য হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার প্রার্থিত কাঞ্চী নগরে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। এই বিশ্বাসবশতঃ তিনি কাঞ্চীতে অবস্থান কালে প্রতি দিবস এক পূর্ণপাত্র জল বরদদেবের সেবার জন্য উপস্থিত করিতেন।

এদিকে যাদবপ্রকাশ এবং তাঁহার শিষ্যগণ রামানুজ

ও গোবিন্দকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তাহাদের মনে নানাপ্রকার সন্দেহ হইতে লাগিল। এমন সময় গোবিন্দ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দকে দেখিয়া যাদবপ্রকাশ তাহাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। যাদব জিজ্ঞাসা করিলেন "রামানুজ কোথায় ?" এই কথা শুনিয়া গোবিন্দ কৃত্রিম শোকের সহিত বলিলেন—"হায়! তাঁহার কি হইল। আমি মনে করিয়াছিলাম তিনি আপনার সহিত গিয়াছেন।" তৎপরে তিনি "হা ভ্রাতঃ তুমি কোথায় গেলে, হায়! আমার কি হইল," ইত্যাদি কাতর উক্তিতে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক কাতরতা এবং ক্রন্দন শুনিয়া সকলেই অনুমান করিলেন যে গোবিন্দ রামানুজ সম্বন্ধ কিছুই জানে না। বোধ হয় তিনি অধিক রাত্রে বনের মধ্যে যাইয়া কোন হিংস্রক জন্তুর হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তৎপরে যাদব সশিষ্য গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন।

কথিত আছে, একদিন যাদব সশিষ্য গঙ্গাস্নান করিতে যাইলেন; গোবিন্দও তাঁহাদের সঙ্গে যাইলেন। যখন গোবিন্দ স্নান করিয়া উঠিবেন, তখন দেখিলেন যে একটি শিবলিঙ্গ তাঁহার হস্তে সংযুক্ত রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তিনি যাদবপ্রকাশ ও শিষ্যগণকে তাহা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহার অর্থ কি ?" যাদব ও তাঁহার শিষ্যগণ তদ্দৃষ্টে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং বলিলেন, "তুমিই ধন্য, তোমারই যথার্থ গঙ্গাস্নান হইয়াছে। ভগবান গঙ্গাধর তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। এরূপ ভাগ্য সহজে কাহারও হয় না।" যাহা হউক, এই দিন হইতেই গোবিন্দকে সকলে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে তাঁহারা তীর্থযাত্রা শেষ করিয়া কাঞ্চী নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। পথিমধ্যে গোবিন্দ সেই লিঙ্গ স্থাপন করিবার উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করিবার জন্য যাদবের অনুমতি লইয়া পশ্চাতে রহিয়া গেলেন।

যাদবপ্রকাশ এবং তাঁহার শিষ্যগণ কাঞ্চীনগরে ফিরিয়া আসিয়া রামানুজকে দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং যখন রামানুজের নিকট সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, তখন ভাবিলেন রামানুজ সাধারণ ব্যক্তি নন। যাদবপ্রকাশ রামানুজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বৎস, আমরা মনে করিয়াছিলাম যে তুমি হিংস্র জন্তুর হস্তে পড়িয়া জীবলীলা সম্বরণ করিয়াছ। যাহা হউক তোমাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া পরম সুখী হইলাম। তৎপরে রামানুজ যাদবপ্রকাশের মঠে পূর্ব্ববৎ যোগদান করিতে লাগিলেন।

এই সময় দাক্ষিণাত্যে যমুনাচার্য্য অসাধারণ পাণ্ডিত্য সহকারে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। তিনি রামানুজ ও যাদবপ্রকাশ সম্বন্ধে সকল কথা শুনিয়া ভাবিলেন যে রামানুজের ন্যায় ব্যক্তি দ্বারাই বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ সুবিধা হইবে; সুতরাং সত্বর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণবধর্ম্ম বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। তিনি সশিষ্য কাঞ্চীনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কাঞ্চীনগরে তিরুকাছি নম্বী বা কাঞ্চীপূর্ণ নামক তাঁহার এক প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তিনি যমুনাচার্য্যের আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া কাঞ্চীনিবাসী কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হইলেন। তৎপরে সকলে মিলিত হইয়া বরদরাজ দেবের মন্দিরে গমন করিলেন।

বরদরাজ-দেবের পূজা সমাপন করিয়া যখন যমুনাচার্য্য মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন তখন একদল লোকের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "উহারা কে ?" নম্বী বলিলেন "সন্ন্যাসী যাদব প্রকাশ ও তাঁহার শিষ্যগণ।" এই কথা অবগত হইয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন "ঐ দলের মধ্যে সম্ভবতঃ রামানুজও আছেন।" নম্বী উত্তর করিলেন "হাঁ দেব, ঐ দলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘাঙ্গ ব্যক্তিই রামানুজ।" যমুনাচার্য্য সেই গৌরাঙ্গ মূর্ত্তির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

কিছু দিন পরে যমুনাচার্য্য শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু সে সময় রামানুজের সহিত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাক্ষাৎ করা বা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন না।

প্রবাদ আছে যে, যমুনাচার্য্যের কাঞ্চী ত্যাগ করিবার কিছু দিন পরে—সেই প্রদেশের রাজার কন্যাকে ব্রহ্মরাক্ষস নামক ভূতে অধিকার করে। রাজা নানা স্থান হইতে বিখ্যাত রোজা আনাইলেন কিন্তু কেহই কিছু করিতে পারিলেন না। এক দিন একজন রাজ-অমাত্য বলিলেন যে, যদি যাদবপ্রকাশের ন্যায় সন্ন্যাসী একবার রাজবাটীতে পদার্পন করেন তাহা হইলে ব্রহ্মরাক্ষস তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিবে। এই কথা শুনিয়া রাজা সশিষ্য যাদবপ্রকাশকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। যাদবপ্রকাশ সন্দেশবাহককে বলিলেন—"যদি ঐ ব্রহ্মরাক্ষস এতাদৃশ ক্ষমতাবান যে তাহাকে দূরীভূত করিবার জন্য আমার উপস্থিতি আবশ্যক বিবেচিত হয়, তাহা হইলে তুমি ফিরিয়া গিয়া আমার নাম করিয়া ব্রহ্মরাক্ষসকে বল, যেন সে রাজকন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া এ অঞ্চল হইতে পলায়ন করে।" দূত-মুখে এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মরাক্ষস বলিলেন—"যদি যাদবপ্রকাশ সত্যসত্যই আমার ভয়ে ভীত হইয়া থাকেন, তবে

তাঁহাকে এস্থান হইতে চলিয়া যাইতে বল।” ব্রহ্মরাক্ষসের এইরূপ স্পর্দ্ধা ও অপমানসূচক বাক্য শুনিয়া যাদবপ্রকাশ ক্রোধে অন্ধবৎ হইয়া সশিষ্য রাজভবনে উপস্থিত হইলেন এবং সর্ব্বসমক্ষে মন্ত্রোচারণ করিতে করিতে ব্রহ্মরাক্ষসাশ্রিত রাজকন্যার প্রতি ধাবমান হইলেন। রাজকন্যা তাঁহার প্রতি পদ প্রসারণ করিয়া উত্তেজিত ভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল—“অরে মূঢ়! তুই ঐ সামান্য মন্ত্র পাঠ করিয়া আমাকে দূর করিতে ইচ্ছা করিয়াছিস্। তোর ঐ মন্ত্র আমি বিশেষরূপে অবগত আছি। তাহা এই। তুই ময়ূরের ন্যায় হতবীর্য্য, কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় মূর্খ। তুই তোর পূর্ব্ব জন্ম সম্বন্ধে কি জানিস্ আর আমার বিষয়ই বা কি জানিস্, সর্ব্বজন সমক্ষে উহা বিবৃত কর্।”

এই কথা শুনিয়া যাদবপ্রকাশ লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। তৎপরে যাদবপ্রকাশ ব্রহ্মরাক্ষসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “তুমি হয় ত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ হইতে পার; আচ্ছা, তুমিই কেন আমাদের উভয়ের পূর্ব্ব-জন্ম-কথা সর্ব্বজন সমক্ষে প্রকাশ কর না?” ব্রহ্মরাক্ষস বলিল—“পূর্ব্বজন্মে তুই জন্তবিশেষরূপে মদুরান্তক হ্রদে বাস করিতিস্। তথায় তীর্থযাত্রী কতিপয় পরম বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্টার ভক্ষণ করিয়া ইহ জন্মে ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিস। আমি পূর্ব্বে উচ্চ ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম; যোগসাধনার নিয়ম ভঙ্গ করা অপরাধে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছি, কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ব্বস্মৃতি নষ্ট হয় নাই।” তৎপরে যাদবপ্রকাশ বলিলেন—“সে যাহাই হউক, এখানে এমন কি কেহ উপস্থিত আছেন—যাঁহার আজ্ঞায় তুমি রাজকন্যাকে পরিত্যাগ করিতে পার?” রাজকন্যা তখন রামানুজের নিকট যাইয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া বলিলেন “যদি এই মহাপুরুষ আজ্ঞা করেন, তাহা হইলে আমি অবিলম্বে এখান হইতে চলিয়া যাইব।” যাদবপ্রকাশের অনুরোধে রামানুজ ব্রহ্মরাক্ষসকে পরিত্যাগ করিতে আজ্ঞা করিলেন। তখন ব্রহ্মরাক্ষস বলিল “প্রভু, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য; তবে আপনি একবার আমার এই অপবিত্র মস্তকে পদস্থাপন করিয়া আমার মুক্তিপথ পরিষ্কার করিয়া দিন।” রামানুজ তাহাই করিলেন। অতঃপর রাজকন্যা সুস্থ হইলে রাজা কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “বৎসে এই মহাপুরুষই তোমাকে ব্রহ্মরাক্ষসের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, ইঁহার পদধূলি গ্রহণ কর।” তৎপরে রাজা রামানুজকে যথোপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে তিনি তৎগ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া যাদবপ্রকাশ ও অন্যান্য শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে মঠাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে যমুনাচার্য্য ক্রমে জীবনের সীমান্তে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার এক চিন্তা উপস্থিত হইল যে তাঁহার মৃত্যুর পর কে তাঁহার স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত হইবে—কাহার স্কন্ধে তিনি সেই গুরুভার অর্পণ করিয়া মরজগত হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন? তিনি মনে মনে বলিলেন—হায়! যদি যাদবপ্রকাশ হইতে রামানুজকে স্বতন্ত্র করিবার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে তাঁহার স্কন্ধে এই গুরুভার চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম। হে বরদরাজ, হে দেব, আমার এই শুভসংঘটন করাইয়া দিন আমি রামানুজকে ভিক্ষা মাগিতেছি।

ভক্তের অন্তরের কথা ভগবান সর্ব্বদাই রক্ষা করেন। শীঘ্রই তাঁহার রামানুজলাভের পথ পরিষ্কার হইল। এক দিবস যাদবপ্রকাশ বৃহদারণ্যক উপনিষৎ হইতে “সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” বাক্যের ব্যাখ্যা করিতে করিতে বলিলেন যে অদ্বৈত মতই শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহা ঈশ্বরের প্রকৃত অস্তিত্ব নির্দ্ধারণ করে। রামানুজ এই বাক্য স্বীকার না করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত মতের প্রাধান্য জ্ঞাপন করিলেন। ইহাতে যাদবপ্রকাশ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রামানুজকে বলিলেন, “তুমি আবার আমার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছ? আমার নিকট আর তোমার শিক্ষা হইতে পারে না। যে কেহ তোমাকে ভাল শিক্ষা দিতে পারেন তুমি এখনই তাঁহার নিকট গমন কর।” রামানুজ সানন্দ মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় জননীকে সকল কথা জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার মাতা বলিলেন, “ভাল বৎস, যাদবপ্রকাশের নিকট তুমি যথেষ্ট বেদান্ত শিক্ষা করিয়াছ। এক্ষণে বরদরাজ দেবের প্রিয় ভক্ত পণ্ডিত কাঞ্চীপূর্ণের নিকট গমন কর। তিনি তোমাকে তোমার ভবিষ্যৎ শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা উপদেশ দিবেন সেই মত কার্য্য করিবে।” তৎপরে মাতৃ-আদেশ অনুসারে রামানুজ নম্বীর নিকট উপস্থিত হইয়া উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। নম্বী বলিলেন, ভগবান বরদরাজ তোমা কর্ত্তৃক আনীত কূপজল বড় ভালবাসেন। তুমি পূর্ব্ববৎ তাঁহাকে ঐরূপ জল দ্বারা সন্তুষ্ট কর। তদবধি রামানুজ পুনরায় আনন্দের সহিত পূর্ব্ব কার্য্যে ব্রতী হইলেন।

অল্পদিন পরে যাদবপ্রকাশের সহিত রামানুজের বিচ্ছেদ এবং তাঁহার বরদরাজ দেবের সেবায় পুনর্নিযুক্ত হওয়ার কথা বৃদ্ধ যমুনাচার্য্যের নিকট পৌঁছিল। এই কথা শুনিয়া যমুনাচার্য্যের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তাঁহার প্রধান শিষ্য মহাপূর্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“বৎস! ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। তুমি এই দণ্ডেই কাঞ্চী যাত্রা করিয়া রামানুজকে আমার নিকট

আনয়ন কর।" মহাপূর্ণ গুরুবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া কাঞ্চী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মহাপূর্ণ কাঞ্চীতে পৌছিয়া কাঞ্চীপূর্ণকে সকল কথা জ্ঞাপন করিলেন। নম্বী তাঁহাকে যে পথ দিয়া রামানুজ প্রতিদিন বরদরাজের সেবার জন্য জলপূর্ণ কুম্ভ আনয়ন করিতেন, সেই পথ দেখাইয়া দিলেন এবং তথায় অপেক্ষা করিতে বলিলেন। তিনি আরও বলিয়া দিলেন যে তিনি যেন তথায় অবস্থান কালে যমুনাচার্যকৃত বরদরাজ দেবের স্তোত্র পাঠ করিতে থাকেন। মহাপূর্ণ নম্বীর আদেশ মত কার্য্য করিলেন। যখন তিনি "স্বাভাবিকা" * ইত্যাদি একাদশ শ্লোকে উপনীত হইলেন, তখন দেখিতে পাইলেন রামানুজ জলপূর্ণ কুম্ভ স্কন্ধে করিয়া মন্দিরাভিমুখে গমন করিতেছেন। এই স্তোত্রটি রামানুজের এত ভাল লাগিল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ তথায় দাঁড়াইয়া পড়িলেন এবং মহাপূর্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই মন্ত্রটি কাহার রচিত এবং কোন্ মহাপুরুষ দ্বারা গীত হইয়াছিল?" মহাপূর্ণ বলিলেন, "শ্রীরঙ্গম-নিবাসী যমুনাচার্য্যনামক জনৈক সন্ন্যাসী এই স্তোত্রটি রচনা করিয়াছেন এবং তিনিই ইহার গায়ক।" রামানুজ বলিলেন, "আমি কি সেই সাধু সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাইতে পারি?" মহাপূর্ণ উত্তর করিলেন, "ইহা অতি সহজ। আমি আপনাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতে পারি।" এই কথা শুনিয়া রামানুজ বলিলেন, "তবে আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক একটু অপেক্ষা করুন আমি মন্দিরে এই জলকুম্ভটি দিয়া আসি।" মহাপূর্ণ বলিলেন, "তাহাই হউক"। তৎপরে রামানুজ দ্রুতপদে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং বরদরাজের নিকট অনুমতি ভিক্ষা করিয়া কাঞ্চীপূর্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া বলিলেন, "প্রিয়তম রামানুজ, তোমার শ্রীরঙ্গম-যাত্রার কথা অবগত হইয়া আমি যারপর নাই প্রীত হইলাম। কারণ তুমি যাঁহার নিকট যাইতেছ সেই মহাপুরুষ যমুনাচার্য্য আমার এবং মহাপূর্ণের গুরু ও ধর্ম্মপিতা। ইহার পর রামানুজ কাঞ্চীপূর্ণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মহাপূর্ণের সহিত শ্রীরঙ্গম যাত্রা করিলেন।

রঙ্গালয় ও দেশোন্নতি।

(শ্রীক্ষেমেন্দ্র নাথ ঠাকুর বি-এস্‌সি)

আজ আমাদের সম্মুখে জীবনমরণের সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আজ আমাদের দেখিতে হইবে যে, আমরা জীবনের পথে—উন্নতির পথে যাইতেছি অথবা মরণের পথে—ধ্বংসের পথে যাইতেছি।

কতক্ষণ বোঝা যায় যে মনুষ্যদেহে জীবন আছে?—যতক্ষণ সে মরণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে। কতক্ষণ বোঝা যায় একটা দেশের জীবন আছে?—যতক্ষণ সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মত সাহস ও স্বাধীনতা রাখে। আজ আমাদের কোন্ অবস্থা উপস্থিত?

আমরা দেশের উন্নতি করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছি। কিন্তু দেশের উন্নতি করিবার উপকরণ কি বিলাসলাস্য, নাট্যকলা, নৃত্যলীলা?—যে দেশের অসংখ্য লোক অনাহারে মৃত্যুগ্রাসে পড়িতেছে—যে দেশে নরনারীর ক্রন্দনে ও দুঃখের গুরুভারে আকাশ এবং সর্ব্বংসহা ধরণীও কাঁপিয়া উঠিতেছে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী যে দেশের নিত্য সহচর, সে দেশকে উঠাইবার অব্যর্থ উপায় কি রঙ্গালয়ে অভিনয়দর্শন? এখন কি আমাদের আমোদ করিবার সময়,—বিলাসে কালক্ষেপ করিবার সময়? মহাত্মা ম্যাট্‌সিনি যখন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন তখন হইতেই শোকপরিচ্ছদ ধারণ করিতেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, যে দেশের এত দুরবস্থা সে দেশে বিলাসিতা সাজে না। ইটালীর তদানীন্তন কালের অবস্থা হইতে আমাদের অবস্থা আরও কত শোচনীয়। আর আমরা কি না শোকসন্তপ্ত হইবার পরিবর্ত্তে বিলাসিতায় মগ্ন—দীনের দুঃখে ব্যথিত হইবার পরিবর্ত্তে রঙ্গালয়ের ঘৃণ্য আমোদে প্রমত্ত। রঙ্গালয়ের নৃত্যলাস্য কি শোকসন্তপ্ত মানুষের হৃদয়ে শান্তিপ্রদানের জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—না তরলমতি লোকদের অন্তরে চাঞ্চল্য ও অশান্তিবর্দ্ধনের জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে? কোনও যুগে কোনও সম্প্রদায় বা জাতিই নৃত্য বা অভিনয় দ্বারা জগতে উন্নতিলাভ করিতে বা চরিত্রবান্ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে নাই। যে যুগে যে জাতিই খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই সকল কার্য্য হইতে বহুদূরে অবস্থান করিয়াছেন। তাঁহারা জানিতেন যে রঙ্গালয়ের অভিনয় মানুষের মনকে বিপথেই লইয়া যাইতে

---

* এই একাদশ শ্লোকের অর্থ এই প্রকার—হে ব্রহ্ম—ব্রহ্মা, শিব এবং ইন্দ্র তোমার মহিমা-সাগরের বিন্দুমাত্র। তোমার সর্ব্বজ্ঞতা এবং অনন্তত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারে না।

সহায়তা করে—কখনই ধর্ম্মের দিকে টানিয়া আনিতে পারে না কারণ চিত্তচাঞ্চল্যকারী সুপ্রচুর নৃত্যগীতবাদ্য শুনিয়া, বিলাসলাস্য, চটুলহাস্য দর্শন করিয়া সাধারণতঃ কেহই অন্বেষণ করিতে বা স্মরণ রাখিতে দৌড়াইবে না যে, সেই সকল নৃত্যগীতের মধ্যে কোথায় ধর্ম্মের কোন্ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। পঙ্কের মধ্যে রত্ন থাকিতে পারে, কিন্তু সুচুক্করবৎ বিনা কি তাহা উদ্ধার করা যায়? দুঃখের বিষয়, সাধারণ লোকে তত যত্ন ও ধৈর্য্য লইতে পারে না; ফলে তাহাদের পঙ্ক মাখিয়া মলিন হওয়াই সার হয়।

মহাপুরুষদের জীবনী পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ ও পাঠ করিয়া সহস্র সহস্র পাপী সুপথে প্রত্যাগমন করিয়াছে। কিন্তু নাট্যমঞ্চে সেই মহাপুরুষগণেরই জীবনীর অভিনয় দেখিয়া, তাঁহাদের সেই সকল উপদেশ-বাণীই রঙ্গমঞ্চ হইতে শুনিয়া, কেহ ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই—ধর্ম্মপরায়ণ হওয়া ত দূরের কথা ধর্ম্মের স্থায়ীভাব কাহারও হৃদয়ে জাগরূক হয় কি না সন্দেহ। দর্শকগণের কথা ত দূরের কথা, যে সকল অভিনেতা সেই সকল মহাপুরুষ সাজিয়া অভিনয় করেন—অভিনয় সৌকর্য্যার্থ ক্রমাগত সেই সকল মহাপুরুষগণের বাণী কণ্ঠস্থ করিলেও তাঁহাদেরও ত কোনই পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। কিরূপেই বা হইবে? অভিনয়-বিদ্যাই যে মিথ্যার ভিত্তির উপর স্থাপিত। পৃথিবীর সকল বিদ্যা, সকল জ্ঞানই সত্যের উপর স্থাপিত—কবি, লেখক বা বৈজ্ঞানিক যাহা তাঁহার সত্য মনের ভাব তাহাই সাধারণতঃ প্রকাশ করিয়া থাকেন—অন্ততঃ লোকে তাঁহাদের রচনাবলীর মতকেই তাঁহাদের মনের সত্যভাব ধরিয়া লইয়া তদনুযায়ী সমালোচনা করে, কিন্তু বেচারী অভিনেতার বেলায় সবই বিপরীত। অভিনেতা যতই নিজের প্রকৃত ভাবকে লুকাইয়া মিথ্যাভাব ফুটাইয়া তুলিতে পারিবেন ততই লোকের প্রশংসা পাইবেন—তাঁহার সত্য প্রকৃতি প্রকাশ পাইলেই বরং অপযশের ভাগী হইবেন। সকল বিদ্যাশিক্ষার্থীই সত্যের পূজা করেন, একমাত্র অভিনয়বিদ্যাশিক্ষার্থীকেই মিথ্যার পদতলে আপনাকে বলি দিতে হয়। এমন কি অভিনয়বিদ্যাশিক্ষায় মিথ্যার এত পূজা করিতে হয় যে "অভিনয় করা"র অর্থই দাঁড়াইয়াছে "ভণ্ডামী করা।" কাহারও ভণ্ডামী আমরা বুঝিতে পারিলে অবজ্ঞাভরে বলি "লোকটা ত বেশ অভিনয় করে।" এত গভীররূপে মিথ্যার ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছে যে বিদ্যা, তাহা কি কখন মানুষের মনে সত্যের জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে পারে? সুতরাং অভিনয় দর্শন করিয়া যদি কেহ ধর্ম্মভাবাপন্ন না হয়—যদি কাহারও মনে স্থায়ীরূপে দয়াদাক্ষিণ্যবীরত্বাদি সদ্ভাবসমূহ অঙ্কিত না হয় তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? যেমন নকল সাধুর অভিনয় দর্শনে কেহ ধর্ম্মপরায়ণ হয় না, তেমনি রঙ্গালয়ের ভণ্ড বীরগণের বীরত্বে বিমোহিত হইয়াও কেহই কখন যুদ্ধে আত্মবিসর্জ্জন করে নাই। অভিনয়দর্শন সমর্থনের জন্য অনেকে বলেন যে তাঁহারা ভাল কাজে উৎসাহ পাইবার জন্য রঙ্গালয়ে যান। এই সকল শ্রেণীর লোককে জিজ্ঞাসা করি, দেশবিদেশে যত মহৎলোক জন্মিয়াছেন তাঁহাদিগের ভিতর কি এমন একজনও আছেন যিনি অভিনয় দেখিয়া মঙ্গলকার্য্যে আত্ম-নিয়োগে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন? বর্ত্তমান ভারতেরই কথা দেখা যাক্। রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র হইতে পরমহংস রামকৃষ্ণ, স্বামীবিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, বিদ্যাসাগর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, আলি ভ্রাতৃদ্বয়প্রমুখ কেহ কি অভিনয় দেখিয়া তবে স্বদেশের মঙ্গল করিতে প্রণোদিত হইয়াছিলেন? অভিনয়দর্শনে চিত্ত যেরূপ চঞ্চল হয় তাহাতে কি দেশের কোনও মঙ্গল করিবার আশা থাকে? আজ কত বৎসর অভিনয় হইয়া আসিতেছে—তাহাদের সহস্র সহস্র দর্শক বা অভিনেতার মধ্যে কি একজনও অভিনয়দর্শনের ফলে মঙ্গলকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন? অভিনয় দেখিয়া কি কেহ সৎ-কর্ম্মে মন দিতে গিয়াছেন?—ক্রমাগত মিথ্যার মধ্যে থাকিয়া কি সৎকর্ম্ম করিবার সাহস ও ইচ্ছা অর্জ্জন করা যায়? মিথ্যার অবিরত আঘাতে কি সৎকর্ম্মের বা সত্যের মেরুদণ্ড স্থির রাখা যায়?

অনেকে আবার বলেন তাঁহারা শিক্ষালাভের জন্য—উপদেশ পাইবার উদ্দেশ্যে অভিনয় দেখিতে যান্। ইহাঁদের স্বীয় মনকে প্রবোধ দিবার পন্থা আবিষ্কার করিবার শক্তি দেখিলে স্তম্ভিত হইতে

হয়। ইঁহারা বিনা পয়সায় শিক্ষালাভের জন্য মহামহোপাধ্যায় বা এল্ এল্ ডি পণ্ডিতগণের বাড়ী যান না—বিনা পয়সায় উপদেশ পাইবার উদ্দেশ্যে নিয়মিত কোন ধর্ম্মসভাদিতে যান না, অথচ পয়সা খরচ করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া মহামূল্য স্বাস্থ্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া রঙ্গালয়ে উপদেশ ও শিক্ষা পাইবার জন্য গিয়া থাকেন! ! ইহা অপেক্ষা আত্মপ্রতারণা আর কি হইতে পারে? বন্ধুগণ, ভাবের ঘরে চুরি করিও না। ঠিক করিয়া বল দেখি, তোমরা কি উপদেশ লইতে রঙ্গালয়ে যাও? কি উপদেশ লইয়া ঘরে ফিরিয়া আইস? আজ যদি রঙ্গালয় হইতে অভিনেত্রীগণকে অপসারিত করা যায় তখনই তোমাদের কথার সত্যাসত্যের প্রমাণ হইয়া যায়।

এই সকল ব্যক্তি রঙ্গালয়ে শিক্ষা করিতে যায় বটে—কিন্তু তাহা ধর্ম্ম বা কর্ম্ম শিক্ষা নহে কিন্তু লালসাশিক্ষা। রঙ্গালয়েই অনেক নিষ্কলঙ্ক যুবকের লাম্পট্যবিদ্যায় প্রথম হাতেখড়ি হয়; রঙ্গালয়ের সাহায্যেই অনেক যুবকের ধ্বংসের পথ প্রথম উন্মুক্ত হয়। এই সকল যুবক সমাজসংস্কার করিবার ইচ্ছায় সমাজের দোষ দেখিতে পয়সা খরচ করিয়া রঙ্গালয়ে যান, কিন্তু অবশেষে নিজেরাই সেই সকল পাপে জড়াইয়া যান। ইহাঁদিগকে জিজ্ঞাসা করি, সমাজসংস্কার করিবার পূর্ব্বে কি নিজের সংস্কার করিলে ভাল হয় না? আজ যদি নাট্যশালার সহস্র সহস্র ভক্ত সমাজসংস্কারের পূর্ব্বে নিজের সংস্কার করিতেন তাহা হইলেই ত সমাজসংস্কার আপনা হইতেই হইয়া যাইত। তাহা হইলে সমাজসংস্কারের জন্য কি আর রঙ্গালয়ে যাইতে হয়? আর এক কথা, অভিনয়দর্শনে কি সত্যই সমাজসংস্কার হয়? তাহা যদি হইত, তাহা হইলে আজ আর অস্পৃশ্যতা থাকিত না—তাহা হইলে আজ আর পণপ্রথা থাকিত না—তাহা হইলে এখনও আমাদের দেশে শতবিধ অনাচার কদাচার থাকিত না। এত বৎসরের মধ্যে মাত্র কয়েকটা সংস্কার অভিনয়ের দ্বারা হইয়াছে বলিলেও বলা যায়; যথা:—বহুবিবাহপ্রথা দূর এবং নীলের অত্যাচার বারণ। যদিও ইহাদের কতটা যে অভিনয় দেখিয়া এবং কতটাই বা পারিপার্শ্বিক প্রভাবে হইয়াছে, তাহা বলা শক্ত। ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুত্থান, একপত্নীক ইংরাজগণের আদর্শ প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক প্রভাবই যে বহুবিবাহপ্রথা দূর হওয়ার একটী প্রধান কারণ তাহা বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না। সেইরূপ নীলকরগণের অকথিত অত্যাচারাদির পারিপার্শ্বিক প্রভাব যে নীলের অত্যাচারে বাধা দিবার এক প্রধান কারণ তাহাও বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না; কারণ প্রধানতঃ কৃষকগণই এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে উঠিয়াছিল এবং বোধ হয় নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে তাহাদের অধিকাংশই রঙ্গালয়ে অভিনয় দর্শন ত দূরের কথা, সম্ভবতঃ বিলাতী ধরণের রঙ্গালয়ের নামও শোনে নাই।

কাজেই যে সকল যুবক সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্যে রঙ্গালয়ে যাইতেছেন বলিয়া আত্মসমর্থন করেন আমরা তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া বলিতেছি যে, বন্ধুগণ, সময় থাকিতে সাবধান হও। পাপের পথ অতি পিচ্ছিল—একবার পড়িলে আর উঠিবার প্রায় সম্ভাবনাই থাকে না। আত্মপ্রতারণা ছাড়। "পাপকে ঘৃণা কর কিন্তু পাপীকে করিও না," এই সূত্র ধরিয়া পাপীর সংসর্গ করিতে ছুটিও না। আর্টের জন্য আর্ট প্রভৃতি মোহময় কথায় ভুলিও না। সমাজের যে সকল দোষ তোমার অজ্ঞাত বা প্রচ্ছন্ন আছে তাহার প্রত্যেকটীই যে তোমার জানিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। সকল পাপ, সকল দোষ—সকলের দেখিবার উপযুক্ত নহে। সকল রোগ সকলের দূর করিবার চেষ্টা করা সাধ্যায়ত্ত নহে। যিনি রোগ দূরীকরণরূপ মহৎকার্য্যে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তিনই সেই সকল রোগ দেখিবার উপযুক্ত। কুষ্ঠচিকিৎসক উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতে জানেন বলিয়া কেবল তিনিই কুষ্ঠাক্রান্তের সংস্পর্শে আসিতে পারেন। কুষ্ঠাক্রান্ত ব্যক্তি রোগযাতনায় কষ্ট পাইলেও যেমন বিশ্বশুদ্ধ লোকের তাহার কাছে যাইয়া কুষ্ঠাক্রান্ত হওয়া সমাজের পক্ষে হিতকর নহে, সেইরূপ কেবল ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ সমাজসংস্কারকই সমাজের পাপ দেখিতে ও তাহা দূর করিতে নিযুক্ত হইতে পারেন। সমাজের সকলেই সকল পাপের ছবি দেখিবার উপযুক্ত নহেন; কারণ যাঁহাদের তত ধর্ম্মবল নাই তাঁহাদের পক্ষে উপযুক্ত সতর্কতা না

লইয়া কুষ্ঠরোগীর সংস্পর্শে আসিয়া কুষ্ঠাক্রান্ত হওয়ার ন্যায়, পাপীর সংস্পর্শে আসিয়া পাপীকে সংশোধন করিবার পরিবর্ত্তে সেই পাপে ডুবিয়া যাওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। আর যাঁহাদের সেরূপ ধর্ম্মবল আছে তাঁহারা রঙ্গালয়ের মিথ্যা-দৃশ্যে সময় নষ্ট করেন না। তাঁহারা জানেন যে অভিনয় দেখিয়া কথনই অসৎকর্ম্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার বল অর্জ্জন করা যায় না বরং নৈতিক অবনতি হওয়াই সম্ভব।

রঙ্গালয়ে পাপের ছবি মাত্র দর্শন করিয়া যদি দর্শকগণের নৈতিক অবনতি হইতে পারে, তবে ইহা কি সম্ভব যে যাহারা অভিনয় করে তাহাদের নৈতিক অবনতি হইবে না?

আমাদের সত্য জীবনে আমরা যথাসাধ্য যে পাপকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করি, অভিনয়-কালে অভিনেতাগণকে সেই সকল পাপেরই দৃশ্য নিজ শরীরে ফুটাইয়া তুলিতে হয়। মানুষ পাপের অধীন হইয়া, রিপুর বশ হইয়া, জ্ঞান হারাইয়া যে সকল লজ্জাকর অকার্য্য কুকার্য্য করে—যে সকল কার্য্য নির্জ্জন ঘরে একলা স্মরণ করিতেও ঘৃণা ও লজ্জাবোধ হয়—অভিনেতাগণকে সজ্ঞানে জানিয়া শুনিয়াও সাধারণের সম্মুখে সেই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়—সেই সকল বাক্য উচ্চারণ করিতে হয়—ইহা অপেক্ষা সজ্ঞান মনুষ্যের পক্ষে আর হীনতর বৃত্তি কি হইতে পারে?

মানুষের প্রকৃতিই এই যে, কোনও কাজ, বিশেষতঃ মন্দ কাজ (অবজ্ঞাভরেও) ক্রমাগত করিতে করিতে তাহা তাহার স্বভাব হইয়া দাঁড়ায়। তখন সে অভ্যাসবশেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও সামান্য অসাবধান হইলেই সেই অভ্যস্ত কুকাজ করিয়া বসে। কাজেই এইরূপ হীনবৃত্তি অভিনয়চ্ছলেও বারংবার করিতে করিতেও যে অভিনেতার নৈতিক জীবনে একটুও ছাপ পড়ে না তাহা সম্ভব নহে। অভিনেত্রীগণের পক্ষেও ঠিক্ এই কথা প্রযুজ্য। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, নৈতিক জীবনের অধোগতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও আজকাল আবার কেহ কেহ নটশ্রেণীর দ্বারা অভিনয় করাইয়া তুষ্ট না হইয়া ভদ্রমহিলাগণকে এই পথে নামাইয়া জাতীয় জীবনকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতে ও ভারতমহিলাদের সম্বন্ধে বিদেশীয়দের অন্যায় ও অসঙ্গত উক্তিকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন; কারণ অভিনয়ের দ্বারা যে নৈতিক অবনতি হওয়া সম্ভব তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি।

যাঁহারা বলেন, পুরুষ নটগণের কি নৈতিক ক্ষতি হয় না—যত ক্ষতি কি নারীর বেলায়? তাঁহাদের বলি, কে বলে পুরুষ নটগণের ক্ষতি হয় না? কিন্তু পুরুষ বেশীর ভাগ বাহিরের কাজে ব্যাপৃত থাকে বলিযাই পুরুষের বেলায় তত ক্ষতি হয় না যত ক্ষতি হয় গৃহলক্ষ্মী নারীর বেলায়।

নারীর উপর জাতিগঠনের ভার। শিশুর উপর মাতার প্রভাব যত অধিক এমন আর কাহারও নহে। আবার মানুষের উপর শৈশবকালের কার্য্য-কলাপাদির প্রভাবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মাতা যদি ধর্ম্মবলে চরিত্রবলে বলীয়সী না হন তবে শিশুকে উত্তরকালে যত ধর্ম্মোপদেশই দেওয়া হউক তাহার ধার্ম্মিক হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। সেই জন্যই প্রবাদ আছে যে, যেমন মা তার তেমনি ছেলে। অবশ্য মাতা সুচরিত্র হইলেই যে সন্তান দুশ্চরিত্র হইবে না আমরা তাহা বলি না, কিন্তু সেরূপ সম্ভাবনা খুব অল্প। তবে লোকের স্বভাবতই মন্দের প্রতি আকর্ষণ থাকায় কখন কখন সেরূপ উদাহরণ পাওয়া যায়; কিন্তু সুচরিত্র মাতার সুচরিত্র পুত্রের উদাহরণই প্রচুর। কিন্তু দুশ্চরিত্র মাতার সুচরিত্র পুত্রের বিষয় সহস্রে একটী পাওয়া যায় ত যথেষ্ট।

যতজন পুরুষের চরিত্রের বল নাই, আজ যদি আমাদের দেশে ততজন নারীরও চরিত্রবল না থাকিত, তবে জাতিহিসাবে আমাদের নাম ধরাপৃষ্ঠ হইতে এতদিনে মুছিয়া যাইত! কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশ এখনও সে বিপদে পতিত হয় নাই—এখনও আমাদের দেশের নারীগণের ধর্ম্মবল, চরিত্রবল, পুরুষ অপেক্ষা যথেষ্ট অধিক। সেই জন্যই আজও এই দেশে অশিক্ষিত লোকও ধর্ম্মের মহিমা বুঝে—সেই জন্যই আজও এ জাতি অন্যান্য প্রাচীন জাতির ন্যায় লুপ্ত হইয়া যায় নাই।

দেশকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্যই আমরা সাবধান করিয়া দিতেছি যে, ভদ্রমহিলা-

গণকে রঙ্গালয়ে নামাইবার ফল অতি মন্দ হইবে—ইহা দ্বারা দেশকে উৎসন্নের পথে লইয়া যাওয়া হইবে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিলে চলিবে না। পাশ্চাত্যদেশ স্বাধীন। আমাদের দেশ পরাধীন। স্বাধীনদেশে যে সকল কাজ চলিতে পারে, পরাধীনদেশে তাহা চলিতে পারে না। স্বাধীনদেশে কোনও বিষয়ের অপব্যবহার দেখিলেই তাহা আইন করিয়া বন্ধ করা যায়—পরাধীনদেশে তাহা কথনই সম্ভব নহে। দেশ ধ্বংসের পথে যাইলেও—সকলে তাহা বুঝিতে পারিলেও—ইচ্ছা করিলেই স্বাধীন দেশের ন্যায় আইন করিয়া অধীনদেশের বিপদ ও পাপ দূর করা যায় না। তাহা যদি সম্ভব হইত তবে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেই আপত্তি করা সত্ত্বেও, যে মদ আমাদের দেশকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে তাহা কেন বন্ধ করা যাইতেছে না? তবে কেন আজও এই দেশে অবাধ বাণিজ্য চলিতেছে? এইরূপ শত শত উদাহরণ দেওয়া যায়। কিন্তু আমেরিকা স্বাধীন বলিয়া দেশের মত হওয়া মাত্রই মদ্যবিক্রয় বন্ধ হইল, জার্ম্মাণীতে অবাধ বাণিজ্য রহিত হইল। সেই জন্য আমরা বলিতেছি যে, যাহাতে সামান্য মাত্রও অনিষ্টের আশঙ্কা আছে তাহা পাশ্চাত্যের অনুকরণে এই পরাধীন দেশে আনিলে দেশকে ধ্বংসের অভিমুখে লইয়া যাওয়া হইবে। আমাদের এই মজা দেখি যে, যেগুলি পাশ্চাত্যগণের সর্ব্ববাদসম্মত গুণ আমরা সেগুলি গ্রহণ করিবার চেষ্টা করি না; কিন্তু যেগুলিতে মতভেদ আছে—যেগুলিতে অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে—যেগুলি মন্দ সুতরাং অনুকরণ করা সহজ, সেইগুলি এদেশে আনিবার চেষ্টা করিয়া দেশকে সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করি। বঙ্গদেশে রঙ্গালয়ের সূত্রপাত হইতে যাঁহারা তাহার নিয়মিত দর্শক হইয়া আসিতেছেন তাঁহারাও বলেন, "নটীর কার্য্য আমাদের দেশে কুলাঙ্গনাগণের মধ্যে প্রসার না হওয়াই প্রার্থনীয়।" ইঁহাদের সকলের মত ও বিবেকবুদ্ধির নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়াও কি ক্ষণস্থায়ী সুখের অথবা ক্ষণস্থায়ী যশের লোভে দেশের চিরস্থায়ী একটা অমঙ্গল ডাকিয়া আনা ঠিক্? মন্দ বিষয়ে না হয় পাশ্চাত্যের নকল না-ই হইল। সাধে কি বলে আমাদের মন দাসভাবে পূর্ণ? যে দেশের যুবকগণের সম্মুখে বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া আছে—একজন সমস্ত জীবন ধরিয়া বিনতন্দ্র হওয়া কাজ করিলেও যে দেশে কার্য্যের শেষ হয় না, সেই দেশের যুবকগণ এখন কিনা আমোদপ্রমোদে অর্থোপার্জ্জন করিতে চান? যে দেশের উন্নতিকল্পে শত শত ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীরগণ স্বীয় শরীরের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত দান করিয়া গিয়াছেন, সেই দেশের কর্ম্মক্ষম যুবকগণ আজ কি না চান বিলাসের সুকোমল শয্যায় গা ঢালিয়া দিয়া রঙ্গালয়ে আস্ফালন করিয়া দেশোদ্ধার করিতে? দেশোদ্ধার করা কি এতই সহজ? কেবল দেশনেতার মৃত্যুতে শোকযাত্রা করিলে হইবে না, শোকসভায় উপস্থিত হইয়া চোখের জলের বড় বড় ফোঁটা ফেলিলে হইবে না, দেশনেতার মহৎ জীবনের অনুসরণ কর। অনুসন্ধান করিয়া দেখ, দেশনেতা যিনি, তিনি কথনই রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখিয়া বা অভিনয় করিয়া দেশসেবায় প্রবুদ্ধ হন নাই, কিন্তু দেশের সত্য দুঃখ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াই তিনি ব্যথিত হইয়াছিলেন; রঙ্গালয়ের অভিনয় হইতে দেশের দুঃখ অনুভব করেন নাই।

বর্ষচিন্তা।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

পূর্ণ একটি বৎসর অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইয়া গেল। আমরা আবার নববর্ষে প্রবেশলাভ করিয়াছি। কয়েক বৎসরের মধ্যে আমরা অনেকগুলি রত্নকে জলাঞ্জলি দিয়াছি। কর্ম্মী অশ্বিনীকুমার দত্ত, প্রতিভাসম্পন্ন রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশ অন্ধকার করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। গত পূর্ব্ববর্ষে বঙ্গের উজ্জ্বলতম রত্ন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরমহাশয়কে হারাইয়াছি। গত বর্ষে বিসর্জ্জন দিয়াছি চিত্তরঞ্জন দাশ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আর, জি, ভাণ্ডারকর এবং ঋষিকল্প দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে। আরও হারাইয়াছি স্যর কে, জি গুপ্ত প্রবীণ সিভিলিয়নকে, নাটোরাধিপতি জগদিন্দ্রনাথকে এবং বিনয়ী ও সৎসাহসী টাকীর জমিদার যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীকে। যে সমস্ত মহাজন বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাই-

তেছেন, দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহাদের স্থান অধিকার করিবার লোক নাই। ইঁহারা চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পশ্চাতে তাঁহারা কর্ম্মোদ্যমের উৎসাহের অনন্ত বীর্য্যের প্রতিভার ও বিনয়ের যে আদর্শ রাখিয়া গেলেন, তাহা ভাবী বংশীয়গণের অন্তরে চিরদিনের জন্য আশার আলোক বিস্তার করিতে থাকিবে; সকলেই আপন আপন জীবনকে সুগঠিত করিবার যথেষ্ট উপকরণ প্রাপ্ত হইবেন। বর্ষার জলোচ্ছ্বাসে নদীর দুই কূল ভাঙ্গিয়া যে মৃত্তিকাস্তূপ ভাসাইয়া লইয়া যায় তাহাতে দেশের আভ্যন্তরীণ কল্যাণ সাধিত হয় না বটে, কিন্তু নদীমুখে প্রকাণ্ড চর বিরচিত হয়। ঠিক তেমনই দেশের আদর্শ স্থানীয় মহাজনগণ যখন চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া যান, তখন সাময়িক ভাবে দেশের ক্ষতি হইলেও তাঁহাদের সমুন্নত জীবনের যে আলেখ্য পশ্চাতে রাখিয়া যান, তাহার ফলে নিজ দেশ ও নিজ সমাজ পরিপুষ্ট হইবার ও নবভাবে বিগঠিত হইবার যথেষ্ট উপাদান লাভ করে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পরবর্ত্তী সময় হইতে এদেশে উল্লিখিত মহাজনগণের নবজীবনের স্পন্দনে চারিদিকে যে অভ্যুদয় পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

গত বর্ষের প্রথম উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে স্বাদেশিকতার প্রসার। অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে দেশবন্ধুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্বরাজ্যদল অবসন্ন হইয়া পড়িবে, তাহার বলবীর্য্য ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু দেখিতেছি নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া স্বরাজ্যদল দিন দিন আপন প্রভাব বিস্তার করিতেছেন। বিলাতী বসন-ভূষণের চাকচিক্যের স্থলে দেশের হস্তজাত শিল্প আপন স্থান অধিকার করিয়া বসিতেছে। বেশবিন্যাসে সারল্য ও মিতব্যয়িতার পরিচয় দিন দিন পরিলক্ষিত হইতেছে।

সত্যের উপরে যাহার প্রতিষ্ঠা তাহার কোন দিন বিনাশ নাই, ইহাই আমাদের অন্তরের প্রগাঢ় বিশ্বাস। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তিরোভাবের পূর্ব্বে আমরা তাঁহাকে বারবার বলিতাম যে, 'আপনি ত চলিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের কি হইবে—এমন জলন্ত আদর্শ আর কে দেখাইতে পারিবে?' তাহার উত্তরে তিনি আমাদের নিরাশার ভাব বিদূরিত করিবার জন্য বলিতেন যে, 'সত্যের বিনাশ নাই; নিশ্চয় জানিও সত্যের উপর যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, তাহা কখনও বিনষ্ট হইবে না। তাহা না হইলে রাজা রামমোহন রায়ের বোঝা কেন আমার স্কন্ধে আসিয়া পড়িবে? আমার সন্তানসন্ততি যদি সে ভাবে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মকে আশ্রয় না দেন, নিশ্চয় জানিও অন্য কেহ উত্থিত হইয়া এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করিবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দিহান হইও না।' তাঁহার অন্তস্থিত বাণী শুনিয়া আমরা স্তব্ধ হইয়া যাইতাম। আমাদের সকল অবিশ্বাস ও নিরাশার ভাব বিদূরিত হইয়া যাইত।

আমরা এখানে একটুকু মাত্র বলিতে চাই যে, স্বাধীনতা মানবের জন্মগত অধিকার, কিন্তু সেই অধিকারের যোগ্যতা লাভ আমাদের সাধনাসাপেক্ষ। ভগবানের মঙ্গল বিধানে আমরা ইংরাজের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম। তাঁহাদের সংস্পর্শে যে আমরা কতকটা এই অধিকার লাভ করিয়াছি, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইংরাজের শাসনে না আসিলে এত অল্প দিনের মধ্যে আমাদের দেশের ভাগ্যাকাশ সুপ্রসন্ন হইতে পারিত না। কিন্তু বালকের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবকের শাসনদণ্ডের কাঠিন্য যেমন শিথিল করিবার বিশেষ আবশ্যক হয়, যাহাতে সে মুক্ত বায়ুতে বিহার করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে, অভিভাবকের সে দিকেও যেমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে, রাজার পক্ষেও তেমনি নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া উদার ভাবে প্রজার মঙ্গলের জন্য বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রয়োজন; তাহা না হইলে প্রজার মনে কৃতজ্ঞতার সঞ্চার না হইয়া ঈর্ষা ও বিদ্বেষের ভাব জ্বলিয়া উঠে।

এবার বর্ষশেষে হিন্দু-মুসলমানের লজ্জাকর বিরোধ-বিসংবাদ কলিকাতার রাজপথকে রক্তে কলঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল। চারিদিকে এরূপ বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছিল যে, অনেক হিন্দু ও মুসলমান সহর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সপ্তাহব্যাপী যে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল, নববর্ষ সঞ্চারের পরেও তাহা শেষ হয় নাই। ফলে অনেক হিন্দু ও মুসলমান হত এবং আহত হইয়াছেন। এরূপ খণ্ডযুদ্ধ কলিকাতার মধ্যে আর কখনও ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আর্য্যসমাজের শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল, মসজিদের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় মুসলমানগণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে ও তাহার ফলে পরস্পরের মধ্যে মারামারির সূচনা হয়; কিন্তু পরে আর্য্যসমাজ-সম্প্রদায় ছাড়াও অন্যান্য সমগ্র হিন্দুসম্প্রদায়ের উপরে কি জানি কোন্ কারণে সহসা মুসলমানের বিদ্বেষ প্রসারিত হইয়া পড়িল। হিন্দুর শিবালয় বিচূর্ণ হইল। প্রতিহিংসার কারণে মুসলমানের ভজনালয়ও বিধ্বস্ত হইল। হিন্দুর অন্যান্য দেবালয় আক্রমণ করিবার জন্য বিপুল আয়োজন চলিল। কিন্তু কলেজের যুবা ছাত্র, শিখ, হিন্দুস্থানী ও মাড়োয়ারীগণের সম্মিলিত চেষ্টায় তাহাদের সে প্রযত্ন ব্যর্থ হইয়া গেল। অনেকে এইরূপ অনুযোগ করেন যে, পুলিশ অধিকতর ঔদাস্যের পরিবর্ত্তে অধিকতর সতর্কতা

ও তৎপরতার পরিচয় দিলে এতগুলি হত্যা ও সাংঘাতিক মারপিট অনুষ্ঠিত হইতে পারিত না। ভাগ্যক্রমে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সমস্ত গোলযোগের পৃষ্ঠপোষকতা করেন নাই। উভয় দলের গুণ্ডাগণই এই সকল অত্যাচারের জন্য প্রধানত দায়ী, ইহাই সকলের ধারণা।

সোমনাথের মন্দিরভঙ্গের পর হইতে প্রায় আট নয় শত বৎসর ধরিয়া মুসলমানগণের হস্তে কত শত হিন্দু ও বৌদ্ধ-মন্দির যে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে, আজ কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? হিন্দুর উপর এই যে অনর্থক নিপীড়ন, ইহা অন্যান্য বিষয়ে সুসভ্য মুসলমানের যে ঘোর কলঙ্ক তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, মুসলমানের মসজিদভঙ্গে হিন্দুর অগ্রসর হওয়া এবারকার বিরোধের বিশেষত্ব। ব্যাপারটি যে ঘৃণার্হ ও লজ্জাকর তাহা কোন রকমেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু দেবমন্দির রক্ষা প্রভৃতি কার্য্যে এবারে হিন্দুরা যে সাহসের পরিচয় দান করিয়াছেন তাহা অভিনব ও উভয় সম্প্রদায়েরই কল্যাণকর; এবং ইহা হইতে ভবিষ্যতে সবিশেষ আশা হয় যে, বাঙ্গালি হিন্দুগণ একদিন সাহসে ও শৌর্য্যে উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন।

মহাত্মা গান্ধী একবার বলিয়াছিলেন যে, হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের মধ্যে নিজ নিজ বলের পরীক্ষা দিবার অবসর না পাইলে উভয়ে স্ব-স্ব অধিকার স্থির করিয়া লইতে পারিবে না। উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া মুসলমানের হস্তে হিন্দু নারীনির্য্যাতনের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই সকল স্থলে পুলিস-নিরপেক্ষ ও আদালত-নিরপেক্ষ আত্মবল প্রয়োগের প্রয়োজন আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়; তাহা না হইলে এ সমস্ত নির্য্যাতনের অবসান হইবে না। পরস্পরের বল যখন পরস্পরে বুঝিতে পারিবে তখন হইতেই প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগ ঘটিবে।

কলিকাতাব্যাপী এই অরাজকতার স্থলে বর্ত্তমানে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছে। পুলিশ ও গোরাসৈন্যের সমাবেশই এই শান্তিস্থাপনের অন্যতম কারণ। ভবিষ্যতে যাহাতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার সখ্য স্থাপিত হয় তাহার জন্য উভয় দলের নেতারা যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহারা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। আমরা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শান্তি ও মিলনের প্রয়াসী। শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই ধর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য। তবে এইরূপ অশান্তির ভিতর দিয়াই যে শান্তির প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে, ইহাও স্মরণে রাখিতে হইবে।

বিগত বৎসরে তিন ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য পূর্ব্ববৎ চলিয়া আসিয়াছে। পরস্পরের মধ্যে মিলনের ভাব অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু অর্থাভাব ও আন্তরিকতার অভাব সকল দলই অনুভব করিতেছেন। মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্মসমাজগুলিও বিপন্ন; অর্থাভাবে প্রচারকদিগকে পোষণ করিতে অক্ষম হইয়া পড়িতেছেন। ইহা নিতান্ত দুঃখের কথা বলিতে হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব ধীরে ধীরে শিক্ষিতগণের হৃদয়ে যে স্থায়ী আসন বিস্তার করিতেছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। ভগবানের করুণার উপরেই আমাদের সমধিক নির্ভর। তাঁহার মঙ্গলবিধানে আমাদের সর্ব্ববিধ অভাব বিদূরিত হইবে, সমগ্র দেশে শান্তির রাজ্য ও জাতিনির্বিশেষে ভ্রাতৃভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

সাংখ্যে ঈশ্বরবাদ।

(অধ্যাপক ৺অভয়কুমার মজুমদার এম-এ লিখিত ইংরাজী নিবন্ধের শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার এম-এ, পি. এইচ্-ডি কৃত অনুবাদ)

ঈশ্বরাস্তিত্বের সাক্ষাৎ প্রমাণ।

আমরা পূর্ব্বে 'সাংখ্যপ্রবচন-সূত্রের' যে সূত্রগুলিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, কেবল সেই সূত্রগুলিই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। কিন্তু আরও অন্যান্য সূত্র আছে, যেগুলি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়; সুতরাং তাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্পষ্ট প্রমাণ দিতেছে। আমরা এক্ষণে সেই সূত্রগুলির বিচার ও আলোচনা করিয়া দেখিব।

(ক) আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, সাংখ্য-প্রবচনের ৯৬ ও ৯৯ সূত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে অধিকতর দৃঢ় ও স্পষ্ট প্রমাণ দিতে পারে এই প্রকার আরও অন্য সূত্র আছে। "স হি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা" ও "ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা" (সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ৩য় অধ্যায়—সূঃ ৫৬ ও ৫৭), এই দুইটী সূত্র দেখা যাউক। এই সূত্র দুইটীর মধ্যে প্রথম সূত্রটীর অর্থ পরিষ্কাররূপে বুঝিবার জন্য ইহাকে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী সূত্রের সহিত একত্র পাঠ করিতে হইবে। সে সূত্র দুইটী এই—"ন কারণলয়াৎ কৃতকৃত্যতা মগ্নবদুত্থানাৎ", ও "অকার্য্যত্বেঽপি তদ্যোগঃ পারবশ্যাৎ"। প্রথমটীর অর্থ—"কারণরূপা প্রকৃতিতে লীন হইলেও কৃতকার্য্যতা নাই অর্থাৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না; কারণ, জলেতে মগ্ন ব্যক্তির উত্থানের ন্যায় পুনরায় উত্থান আছে।" দ্বিতীয়টীর অর্থ—"যদিও প্রকৃতি কার্য্য অর্থাৎ কোনও কিছু হইতে উৎপাদ্য বস্তু নহে, অথবা অপরের দ্বারা স্বকার্য্যে প্রণোদিতও নহে, তথাপি তাহার পুনরুত্থান অপরের

অধীনতা হইতেই সম্ভূত।" এখন প্রশ্ন হইতে পারে, প্রকৃতি কাহার অধীন? বিজ্ঞানভিক্ষু অর্থ করিয়াছেন—"পারবশ্যাৎ পুরুষার্থতন্ত্রত্বাৎ। বিবেকখ্যাতিরূপ-পুরুষার্থ-বশেন প্রকৃত্যা পুনরুত্থাপ্যতে স্বলীন ইত্যর্থঃ", অর্থাৎ "'পারবশ্য' অর্থে পুরুষের উদ্দেশ্যরূপ শাসনের অধীনতা হেতু। (প্রকৃতি-পুরুষ-) বিবেক-প্রকাশরূপ পুরুষের উদ্দেশ্যের অধীনতা হেতু প্রকৃতির মধ্যে লীন ব্যক্তি পুনরায় প্রকৃতির দ্বারাই উত্থাপিত হয়। ইহাই তাৎপর্য্য"। 'পারবশ্য' পদের যে 'পুরুষার্থতন্ত্রত্ব' অর্থাৎ 'পুরুষের উদ্দেশ্যরূপ শাসনাধীনত্ব' বলিয়া অর্থ করা হইয়াছে, তাহা একেবারে অস্বাভাবিক। 'পারবশ্য' শব্দটী 'পরবশ' শব্দ হইতে উৎপন্ন, এবং এই পরবশ (পর = অন্য + বশ = অধীন হওয়া) শব্দের অর্থ অপরের অধীন; সুতরাং পারবশ্য-শব্দের অর্থ—'অন্যের নিকট অধীনতা' হওয়াই উচিত। অনিরুদ্ধ অবিকল এই অর্থই করিয়াছেন। কারণ, 'পারবশ্যাৎ' শব্দের অর্থ তিনি করিয়াছেন—'পরতন্ত্রত্বাৎ' অর্থাৎ অপরের নিকট অধীনতা হেতু এবং 'পর' পদটীর তিনি অর্থ করিয়াছেন 'আত্মা'। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে প্রকৃতি এই যে আত্মার অধীন, সেই আত্মা কে? পরবর্ত্তী সূত্রে ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে—'সহি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা', অর্থাৎ 'তিনি সবই জানেন এবং সবই করেন—সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তা'। এখানে 'সঃ' অর্থাৎ তিনি—এই শব্দের দ্বারা স্পষ্টতঃই ঈশ্বরই বুঝায়; কারণ একমাত্র ঈশ্বরই সকল জানিতে পারেন ও সকল করিতে পারেন। কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু ইহার ভিন্নরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন—"সহি পূর্ব্বসর্গে কারণলীনঃ সর্গান্তরে সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তেশ্বর আদিপুরুষো ভবতি প্রকৃতিলয়ে তস্যৈব প্রকৃতিপদপ্রাপ্ত্যৌচিত্যাৎ", অর্থাৎ "কারণ, যিনি পূর্ব্বসৃষ্টিতে প্রকৃতিরূপ কারণেতে লীন ছিলেন, পরসৃষ্টিতে তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বরস্বভাবাপন্ন আদিপুরুষ হয়েন; কারণ, তাঁহার প্রকৃতিতে লীন হওয়া হেতুই প্রকৃতিপদপ্রাপ্তি তাঁহারই পক্ষে উপযুক্ত"। সুতরাং 'সঃ' অর্থাৎ 'তিনি' এই শব্দে বিজ্ঞান পুরুষকেই বুঝেন, ঈশ্বরকে মোটেই নয়। কিন্তু এই অর্থের দ্বারা বিজ্ঞান কয়েকটী ভীষণ ভুল করিয়াছেন। যে সকল পুরুষ মুক্তিলাভ করে না, প্রলয়কালে তাহারাই প্রকৃতিতে লীন হয়—মুক্তপুরুষেরা হ'ন না, এবং কেবল অমুক্ত (বা বদ্ধ) পুরুষেরাই পরবর্ত্তী সৃষ্টিতে উত্থিত হয় এবং তাহাদের পূর্ব্বসংস্কার অনুসারে কাজ করিতে থাকে। এখন প্রশ্ন হইতেছে—যাহারা এখনও বদ্ধ, এখনও যাহারা আত্মজ্ঞান লাভ করে নাই, সেই সকল অমুক্ত পুরুষেরা কিরূপে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বর হইতে পারে? অধিকন্তু 'সঃ' পদটী একবচনান্ত, সুতরাং ইহাতে মাত্র একজন পুরুষকেই বুঝায়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই অসংখ্য পুরুষের মধ্যে কোন্ পুরুষটী সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বর? হয় সকলেই ঈশ্বর হইবে, নতুবা কেহই হইবে না। আবার বিজ্ঞান পরবর্ত্তী সূত্রের ব্যাখ্যা করিবার সময় নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, সান্নিধ্য হেতু এক নিত্য ঈশ্বরের প্রমাণ আছে বলিয়া শ্রুতি ও স্মৃতি সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হইতেছে। (সান্নিধ্যমাত্রেশ্বরস্য সিদ্ধিস্তু শ্রুতিস্মৃতিষু সর্ব্বসম্মতেত্যর্থঃ)। সেই পরবর্ত্তী সূত্রটী এই—"ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা", অর্থাৎ "এইরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ বা প্রমাণিত"। 'ঈদৃশ' শব্দটী পূর্ব্ব সূত্রের সহিত এই সূত্রের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বুঝাইতেছে যে 'এইরূপ' অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তা। কিন্তু বিজ্ঞান 'সঃ' পদটীর যেরূপ অর্থ করেন তাহাতে এই দুইটী সূত্র পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা অসম্বদ্ধ হইয়া পড়ে। কারণ, যদি 'সঃ'-পদটী পুরুষকে বুঝায়, তাহা হইলে 'সর্ব্বজ্ঞ' ও 'সর্ব্বকর্ত্তা' এই পদ দুইটী পুরুষেরই বিশেষণ হইয়া পড়ে, এবং দ্বিতীয় সূত্রের ঈশ্বরের বিশেষণ হইতে পারে না। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে 'ঈদৃশ' শব্দটী হয় অর্থহীন হইয়া পড়ে, নতুবা ইহার কোনও অস্বাভাবিক অর্থ করিতে হয়। এই সকল বিচার হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, 'সঃ'-পদটী ঈশ্বরকেই বুঝাইতেছে।

অনিরুদ্ধও উক্ত (৫৬) সূত্রটীর অবিকল এইরূপ অর্থই করিয়াছেন। তিনি বলেন, "পরঃ আত্মা কিংরূপঃ? ইত্যত্র আহ,—'সহি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা'॥ প্রকৃতিপ্রতিবিম্বিতত্বাৎ এবম্ অভিমানঃ"। অর্থাৎ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারে "'পর আত্মা কিরূপ?' ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—'তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তা'। এই অভিমান অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি বা আত্মস্বরূপজ্ঞান প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হওয়াতেই উদিত হইতেছে বা হয়"। ৫৭ সূত্রটীর অনিরুদ্ধ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—"তাত্ত্বিকম্ এব কর্ত্তৃত্বং ভবতু, কিং প্রতিবিম্বকল্পনয়া? তথা চ ন্যায়াভিমতঃ এব ঈশ্বরঃ অস্তি? ইত্যত্রাহ—যদি অস্মদভিমতঃ আত্মা ঈশ্বরঃ, ভবতু। নায়াভিমতে চ প্রমাণং নাস্তি। এতচ্চ প্রথমাধ্যায়ে 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' ইতি সূত্রে বর্ণিতম্। দ্বিতীয়াধ্যায়ে 'বিমুক্তবিমোক্ষার্থম্' ইতি সূত্রে স্বার্থং পরার্থঞ্চ প্রধানপ্রবৃত্তিঃ ইতি উক্তম্। অত্র স্বার্থস্য গৌণত্বম্।" অর্থাৎ "আত্মার কর্ত্তৃত্ব প্রতিবিম্ব না হইয়া বাস্তবিকই হউক না কেন? কারণ, কেহ ত প্রশ্ন করিতে পারে যে কর্ত্তৃত্বকে প্রতিবিম্ব মনে করিবার কি আবশ্যক? সুতরাং ইহা হইতে পাওয়া যায় যে ন্যায়দর্শনে যে ঈশ্বরের ধারণা করা হইয়াছে তিনিই আছেন। এই সম্বন্ধে সূত্রকারের অভিপ্রায় এই—ইহা দ্বারা যদি তোমার এই কথা বলিবার ইচ্ছা থাকে যে আমাদের ধারণার বিপরী-

ভূত আত্মাই ঈশ্বর, তাহা হইলে তাহাই হউক। কিন্তু ন্যায়দর্শনে যেরূপ ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে সেরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ নাই। এই কথাই প্রথম অধ্যায়ের ৯২ সূত্রে বলা হইয়াছে—'কারণ ঈশ্বর প্রমাণের বিষয় নহেন', এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম সূত্রেও বলা হইয়াছে—'প্রকৃতির কর্তৃত্ব বা জনয়িতৃত্ব হয় মুক্ত-পুরুষদিগের মুক্তির জন্য, নতুবা তাহার নিজেরই জন্য'।" এস্থলে অনিরুদ্ধ স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে ৫৬ সূত্রে আত্মার যে কথা বলা হইয়াছে, এবং প্রকৃতিমধ্যে প্রতিবিম্বিতত্ব হেতু সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্তৃরূপে তিনি যে আত্মার ধারণা করিয়াছেন—তিনিই ঈশ্বর। তিনি কেবল ন্যায়দর্শনে যে ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে—যিনি বস্তুতই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তা কিন্তু প্রতিবিম্বিতরূপে নহেন—তাঁহারই অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। ইহার সহিত পঞ্চম অধ্যায়ের ১১৬ সূত্রটীও বিবেচনা করিতে হইবে—সূত্রটী এই—"সমাধি-সুষুপ্তি-মোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা।" অর্থাৎ "সমাধি, সুষুপ্তি ও মোক্ষের অবস্থায় পুরুষ ব্রহ্মরূপে (ঈশ্বররূপে) অবস্থিতি করেন"। এখানে 'ব্রহ্মরূপতা' এই শব্দটী বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে হইবে। ইহার যথার্থ অর্থ কি? অনিরুদ্ধ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—"ব্রহ্মণা সহ তুল্যরূপতা, সর্ব্বত্র বাহ্যাসংবেদনাৎ, ন তু ব্রহ্মরূপতা", অর্থাৎ "ব্রহ্মের সদৃশ রূপ প্রাপ্তির অবস্থা, যেহেতু তখন সর্ব্বত্রই বাহ্যবস্তু-জ্ঞানের অভাব ঘটে—কিন্তু ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তির অবস্থা নহে।" বৈদান্তিক মহাদেব ইহার অর্থ করেন—"ব্রহ্মরূপপ্রাপ্তির অবস্থা" অর্থাৎ "বেদনার অনমুভূতি।" বিজ্ঞানভিক্ষু অর্থ করেন—"ব্রহ্মরূপতা বুদ্ধিবৃত্তিবিলয়তস্তদৌপাধিক-পরিচ্ছেদ-বিগমেন স্বস্বরূপপূর্ণতয়াবস্থানম্"। অর্থাৎ, "ব্রহ্মরূপতার অর্থ নিজ স্বরূপে বা নিজ যথার্থরূপে পূর্ণ হইয়া অবস্থান, কারণ বুদ্ধিবিকারের বিলয় হওয়ায় বুদ্ধি-বিকারজনিত যে ঔপাধিক বা বাহ্যধর্ম্মারোপরূপ পরিচ্ছেদ বা গণ্ডী, তাহাও বিলীন হয়।" ইনি আরও বলেন—"অস্মচ্ছাস্ত্রে চ ব্রহ্মশব্দ ঔপাধিকপরিচ্ছেদ-মালিন্যাদিরহিত-পরিপূর্ণচেতন-সামান্যবাচী, ন তু ব্রহ্মমীমাংসায়ামিবৈশ্বর্য্যো-পলক্ষিতপুরুষমাত্রবাচীতি বিবেক্তব্যম্"। অর্থাৎ "এবং আমাদের শাস্ত্রে 'ব্রহ্ম'-শব্দটী বুঝায় সাধারণতঃ সচেতন বা বুদ্ধিবিশিষ্ট সত্তা—যাহা স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং উপাধিকৃত বা বাহিরারোপিত গণ্ডী, মলিনতা প্রভৃতি বর্জ্জিত; কিন্তু ইহাতে বেদান্তের ন্যায় সর্ব্বেশ্বরত্বলক্ষণলক্ষিত সেই বিশিষ্ট পুরুষকে (ঈশ্বরকে বা ব্রহ্মকে) বুঝায় না, এই পার্থক্য মনে রাখিতে হইবে।" উপরি-উক্ত সূত্রটীতে অন্ততঃ অনিরুদ্ধ ও মহাদেব স্বীকার করিয়াছেন যে, সাংখ্যকার ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন—যে ঈশ্বর বা ব্রহ্মের ভাব বা তদনুরূপ ভাব পুরুষ সমাধি, সুষুপ্তি ও মোক্ষ অবস্থায় প্রাপ্ত হয়—যে অবস্থায় পুরুষ উপাধি-কৃত সীমার বন্ধন বা বহিরাবরণ হইতে মুক্ত। ইহা দ্বারা আরও প্রমাণ হয় যে পুরুষ বস্তুতঃ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে, কিন্তু পুরুষ কেবল উপাধি বা বহিরাবরণ দ্বারা মণ্ডিত হইয়াই, অর্থাৎ প্রকৃতি ও তাহার বিকৃতির সহিত যুক্ত হইয়াই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হয়। এই স্বীকারোক্তিগুলি আমরা একটু অবহিতভাবে বিচার করিলে সহজেই দেখিতে পাই যে, ঈশ্বর বা ব্রহ্ম নামে কেবল একমাত্র পুরুষই আছেন এবং তিনি প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করেন এবং তদ্দ্বারা সংখ্যাতীত জীব বা পুরুষরূপে আপনাকে বহুধা প্রতিপন্ন করেন। বিজ্ঞানভিক্ষুর ব্যাখ্যা ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়; কারণ, তাঁহার ব্যাখ্যানুসারে সমাধি, সুষুপ্তি ও মোক্ষাবস্থায় যদি পুরুষই (জীবই) ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে তখন কি প্রভেদ থাকে? সে ক্ষেত্রে তাহারা কি একেবারে এক হইয়া যায় না? তাহারা এক হইলে কিরূপে বহুত্ব থাকিতে পারে? পার্থক্য বা প্রভেদ হইতেই বহুত্ব, এবং প্রভেদাভাবে বহুত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং বিজ্ঞানের নিজের ব্যাখ্যাই আমাদিগকে এই তত্ত্বে উপনীত করে যে, সকল জীবই (পুরুষই) বস্তুতঃ এক ও অভিন্ন, অর্থাৎ তাহারা একই পুরুষের (ব্রহ্মের) বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। ব্রহ্ম বা ঈশ্বররূপী একমাত্র পুরুষই আপনাকে বহুধা করিয়া জীবনামধারী সংখ্যাতীত পুরুষরূপে প্রতিভাত হইতেছেন; সুতরাং বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার শেষাংশটীও ঐরূপ ভ্রান্ত।

বৈদান্তিক মহাদেব 'স হি' শব্দে 'প্রকৃতিপদার্থই' বুঝেন। ইহা আরও অসম্ভব। তিনি মনে করেন যে, অচেতন প্রকৃতির অধ্যক্ষরূপে একটী সচেতন পুরুষের প্রয়োজন এবং সেই সচেতন পুরুষের সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তা হওয়া চাই-ই—এই মতবাদটী বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে প্রকৃতির পরিণামপ্রাপ্তির স্বভাব থাকায় ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব যে, প্রকৃতি জ্ঞানের পরিণামরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, এইরূপই ইহার তাৎপর্য্য। কিন্তু এরূপ অনুমান আদৌ কিরূপে হইতে পারে তাহা বুঝা কঠিন। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, ইহার ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বসূত্রে (৫৫সূঃ) প্রশ্ন উঠিয়াছে—প্রকৃতি কাহার অধীন? এবং তাহার উত্তর এই সূত্রে দেওয়া হইয়াছে। অনিরুদ্ধ ও বিজ্ঞান উভয়েরই এই মত। সুতরাং মহাদেবের অনুমান সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও অযৌক্তিক; কারণ তাহা হইলে এই সূত্রটী ও পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রটী একেবারে অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। আরও একটী বৈষম্য ঘটে যে, অচেতন প্রকৃতি কিরূপে

সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে? মহাদেবের ব্যাখ্যা বড় অদ্ভুত। তিনি বলেন যে যেহেতু কেবলমাত্র প্রকৃতিই পরিণাম-স্বভাবা, সুতরাং সে নিজেকে চেতনরূপে, অতএব সর্ব্বজ্ঞরূপে, পরিণত করিতে পারে। কিন্তু মহাদেব ভুলিয়া যাইতেছেন যে প্রকৃতি কেবল নিজের প্রকৃত স্বভাবের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই নিজেকে পরিবর্ত্তিত করিতে সক্ষম, এবং প্রকৃতি অচেতনস্বভাবা হওয়ায় নিজেকে এইরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না যাহাতে সে চেতনস্বভাবা হইতে পারে; কারণ, তাহা হইলে ইহাতে পরিণতি বা ক্রমবিকাশের নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। অবশ্য এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, চেতন-স্বভাব মহৎ বা বুদ্ধি তাহা হইলে কিরূপে প্রকৃতির সর্ব্বপ্রথম পরিণাম হয়? প্রকৃতি স্বয়ং যদি অচেতন বা জড়স্বভাবা হয়, তাহা হইলে সে কিরূপে চেতনকে উৎপন্ন করিতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, সাংখ্যদর্শনের ইহা একটী স্বতঃসিদ্ধ মত যে, প্রকৃতির বিপরিণাম চেতনরূপী পুরুষের সহিত সংযোগ বশতঃই ঘটিয়া থাকে, সুতরাং প্রকৃতির চেতনা আভাসরূপিণী (apparent)—বাস্তব (real) নহে, অর্থাৎ একটী জবাফুল কোন স্ফটিকের গাত্রে প্রতিবিম্বিত হইলে স্ফটিকের গাত্রটী যেমন লোহিত দেখায়, কিন্তু ঐ লৌহিত্য স্ফটিকের বাস্তব সম্পত্তি নয়; সেইরূপ পুরুষের চেতনা বা বুদ্ধি প্রকৃতির উপর প্রতিবিম্বিত হওয়াতেই প্রকৃতিকে চেতনরূপিণী বলিয়া বোধ হয়; সুতরাং প্রকৃতির চেতনা ধারকরা—আভাসময়ীমাত্র, তাহার প্রকৃত স্বভাব অচেতন। (ইহাই সাংখ্যমতের সাধারণ লৌকিক ব্যাখ্যা, কিন্তু আমরা পরে দেখাইব যে ইহার একটী নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে।)। কিন্তু আরও আপত্তি হইতে পারে যে, প্রকৃতি চেতনস্বভাব প্রাপ্ত হইবার পর সর্ব্বজ্ঞাও হইতে পারে; কিন্তু তাহা অসম্ভব। কারণ, 'সর্ব্বজ্ঞ' শব্দের অর্থ যিনি সবই জানেন, এবং প্রকৃতিকে সর্ব্বজ্ঞা হইতে হইলে তাহার একথা অবশ্যই জানিতে হইবে যে সর্ব্বজ্ঞা হইবার পূর্ব্বে প্রকৃতি কিছুই জানিত না—সে অচেতন ও জড়স্বভাবা ছিল—অর্থাৎ চেতনসম্পন্না ও জ্ঞানস্বভাবা হইবার পূর্ব্বে প্রকৃতি চেতন-সম্পন্না ও জ্ঞানস্বভাবাই ছিল—এ যুক্তি একেবারেই অসম্ভব ও স্ববিরোধী। এই সকল কারণে আমরা মহাদেবের ব্যাখ্যা পরিহার করিব ও অনিরুদ্ধ যেরূপ বলিয়াছেন সেইরূপ বলিব যে 'স'-শব্দে পরমাত্মা বা ঈশ্বরকেই বুঝায়, প্রকৃতিকে নহে।

সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, প্রকৃতি যে আত্মার অধীন থাকিয়া ও যাঁহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া পুনরাবির্ভূত হন এবং সৃষ্টি করেন, সেই আত্মা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই নহেন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রুতিবাক্যানুযায়ী সাংখ্য বলেন যে ঈশ্বর নিষ্ক্রিয়; সুতরাং কিরূপে তিনি সর্ব্বকর্ত্তা হইতে পারেন? উত্তর এই যে, প্রকৃতি ঈশ্বরের প্রভাবে ও পরিচালনাতেই কার্য্য করে বলিয়া ঈশ্বরকে অন্ততঃ পরোক্ষ ভাবেও, সর্ব্বকার্য্যের ও সর্ব্বকর্তৃত্বের মূল উৎস বলা যাইতে পারে, যেরূপ রাজা যুদ্ধ করিতেছেন বলা হয় (সাংখ্যের দৃষ্টান্ত)—যদিও তিনি বাস্তবিক যুদ্ধ করেন না, তাঁহার সৈন্যেরাই তাঁহার আজ্ঞাধীনে, তাঁহারই পরিচালনায় যুদ্ধ করে। ইহাই ইহার সাধারণ উত্তর; কিন্তু আমি পরে প্রমাণ করিব যে ঈশ্বরই প্রকৃত কর্ত্তা—প্রকৃতি কেবল তাঁহার হস্তের যন্ত্রমাত্র।

ভ্রান্ত পথিক।

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

আরোহিয়া রুদ্ধবাজী
কর্ণধারমুক্ত মনোরথে,
অন্ধসম ফিরিলাম
জীবনের সুদুর্গম পথে,

লক্ষ্যহীন ভ্রমিয়াছি
অভ্রচুম্বী নগরাজশিরে
সুনিবিড় বনরাজি-
অভ্যন্তরে পশিয়াছি ধীরে।

আঁখির আদেশে আমি
শুনি নাই প্রাণের আহ্বান,
মোহাবেগপূর্ণচিতে
মানি নাই বিশ্বের বিধান।

শুধু যাহা ক্ষণতরে
উঠেছিল চিত্তে জেগে মোর—
সেই ক্ষণিকের নেশা
করেছিল অন্তর বিভোর।

ভাবি নাই, বুঝি নাই—
ছুটিয়াছি শুধু তারি আশে,
স্তব্ধ আজি হেরি তারে
সমুদ্যত মোর সর্ব্বনাশে।

বহু দুঃখ ভুঞ্জিয়াছি
বাধা বহু করেছি লঙ্ঘন
কিন্তু হায় বৃথা হেরি
আমরণ মম পর্য্যটন।

অগ্রগামী শত সাথী
হর্ষে করে পাথেয় সঞ্চয়,
পথভ্রান্ত শ্রান্ত আমি
সর্ব্বহারা ! ফিরি বিশ্বময় ।

কত ক্লেশ-ঘনঘটা
ক্ষেত্র কত করেছে উজ্জ্বল,
অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে মোর
সর্ব্বচেষ্টা হয়েছে বিফল ।

অভিজ্ঞতা অজ্ঞতায়
পরিণত—অপূর্ব্ব সন্দেশ !
এ বিচিত্র ইতিহাস
শুনে নাই কভু কোন দেশ ।

বিঘ্নবাহী যে বিভ্রম
ঘটাইল এ দৃঢ় প্রমাদ,
প্রাণ চাহে তার সনে
ঘটাইতে চিরস্থায়ী বাদ ।

তাই আজি এ দুর্দ্দিনে
সিন্ধুবক্ষে হয়ে মজ্জমান
তরিবারে পারাবার
প্রাজ্ঞ কর্ণধার চাহে প্রাণ ।

এ সঙ্কটে বন্ধু তুমি
শুনি মম কাতর আহ্বান—
শ্রেষ্ঠ প্রদর্শকরূপে
ধরি' পথ হও আগুয়ান ।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ।

মিশ্র বারোয়াঁ—দাদ্‌রা ।

তোমার দয়া চাই জননী
তোমার দয়া চাই
অঙ্গে আমার নাই শকতি
ভকতি মোর নাই ।
কতবারই জ্বালনু বাতি
নিভে গেল ঝড়ে—
পরাণ কাঁপে ডরে,
এবার আমি জেনেছি ঠিক্
আর গতি মোর নাই
তোমার অমল চরণ বিনা
সকলি বৃথাই ।

তোমার দয়া ঝরলে পরে
মরুর বুকে নির্ঝর ঝরে
শুষ্ক তরু মুঞ্জরে সে
মোহন মন্তরে ।
তাইতো তোমার চরণতলে
এসেছি গো ফিরে—
ভাসি নয়ন নীরে,
চরণধূলা দাও জননী
আর কিছু না চাই
সকল গ্লানি—মনের গ্লানি
নিমেষে মুছাই ॥

কথা সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল ।

১´ • ১´ • ১´
I। সা সরা জ্ঞা। জ্ঞা জ্ঞা। I রজ্ঞা মপা পা। পা পা -া I জ্ঞমা জ্ঞা রা।
তো মা॰ র্ দ য়া • চা॰ •ই জ ন নী • তো মা •

• ১´ • ১´ •
।সা ন্া ন্া I সা -া -া। -া -া -া I পা -া পা। পা পধা -ণা।
র দ য়া চাই • • • • • অ ঙ্ গে আ মা॰ র্

১´ • ১´ • ১´
।ণা ধা ধা। পা পা -া I ধা ধপা -া। মা গা মা I গমা পা -া।
না ই॰ শ ক তি • ভ ক • তি মো র্ না॰ ই •

•
।-া -া -া II
• • •

১´ • ১´ • ১´
II প্মা পা মা | গা গা মা I পা না নর্সা | র্সা র্সা -া I র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া |
ক ত • কায় ই • আ ন্ দ • বা জি • মি তে •

• ১´ • ১´ •
| র্রা র্সা র্রা I না র্সা -া | -া -া -া I না না -পা | পা না -া I
গে ল • ঝ ড়ে • • • • প রা ণ্ কাঁ পে •

১´ • ১´ • ১´ •
I না র্সা -া | -া -া -া I র্সা র্সা -া র্সা র্সা র্রা I র্সা ণা -া | ধা পা -া I
ড রে • • • • এ বা র্ আ মি • জে নে • ছি ঠি ক্

১´ • ১´ • ১´
I ণা -া ণা | ধা পা মা I পা -া -া | -া -া -া I সা সরা- জ্ঞা |
আ র গ তি মো র্ নাই • • • • • তো মা • র্

• ১´ • ১´ •
| জ্ঞা জ্ঞা -া I পা পা -া | পা পা -া I মা জ্ঞা- রা | জ্ঞা -রা ন্া I
অ ম ল্ চ র ণ বি না • স ক • লি • বু

১´ •
I সা -া -া | -া -া -া II
থাই • • • • •

১´ • ১´ • ১´
II সা সরা -জ্ঞা | রা জ্ঞা -া I রা -া জ্ঞা | রা জ্ঞা -া I পা পা -া |
তো মা • র দ য়া • ঝ র্ লে প রে • ম রু র

• ১´ • • ১´ •
| পা পা -া I রমা জ্ঞা -া | রা সা -া I পা -া পা | পা পধা -ণা I
বু কে • নি • ঝ র্ ঝ রে • শু ষ ক ত রু • •

১´ • ১´ • ১´
I ণা -া ণা | ধা পা -া I ধা ধা পা | মগা -া মা I পা -া -া |
মু কু ল রে সে • মো হ ন্ ম ন্ ত রে • •

•
| -া -া -া II
• • •

১´ • ১´ • ১´
II পা -া মা | গা গা মা I পা না -া | না র্সা -া I র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া |
তা ই তো তো মা র্ চ র ণ ত লে • এ সে •

• ১´ • ১´ •
| র্রা র্সা র্রা I না র্সা -া | -া -া -া I না না পা | পা না -া I
ছি গো • ফি রে • • • • ভা সি • ন য় ন্

১´ • ১´ • ১´
I না র্সা -া | -া -া -া I পা র্সা -া | র্সা র্সা র্রা I র্সা -া ণা |
নী রে • • • • চ র ণ ধূ লা • দা ও জ

• ১´ • ১´ •
| ধা পা -া I ণা -া ণা | ধা পা মা I পা -া -া | -া -া -া I
ন নী • আ র কি ছু না • চাই • • • • •

১´ • ১´ • ১´ •
I জ্ঞা জ্ঞা -া | জ্ঞা জ্ঞা -রা I পা পা -া | পা পা -া I রমা জ্ঞা -া |
স ক ল্ গ্লা নি • ম নে র্ গ্লা নি • নি • যে •

• ১´ •
| সা -রা ন্া I সা -া -া | -া -া -া II
যে • বু ছাই • • • • •

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়)

বিগত শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা করিবার সময় আমরা অনেকে সেই সময়কার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার কথা ভুলিয়া যাই এবং অধিকাংশ স্থলে আমরা বর্ত্তমানের তুলাদণ্ডে সেই যুগের অনেককে বিচার করিয়া গ্রহণ করিবার সময় একটা ভুল করি; সে ভুলটী এই যে, আমরা সেই সময়কার কথা ও মাপ দিয়া তাঁহাদের ওজন করি না; আমরা তাঁহাদের ওজন করি আজকালকার দাঁড়িপাল্লায়। যে কয়জন দারুণ দুঃসাহসী পুরুষ লোকাপবাদ ও আত্মিয়ের মধ্য দিয়া সামান্য বাঁশ আর তক্তা সাজাইয়া বাংলার নাট্য-মঞ্চের প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন—আজ রঙ্গমঞ্চের স্বাভাবিক ক্রমোন্নতির ফলে তাঁহাদের সেই আদিম প্রচেষ্টাগুলি অতি সামান্য লাগিতে পারে; কিন্তু কলা লক্ষ্মীই জানেন, তাঁহাদের অন্তরের নিষ্ঠা ও গভীরতা কত গাঢ় ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যেদিন প্রথম প্রতিভার অসম দুঃসাহসিকতায় সাহিত্যে নব নব মানব সৃষ্টি করিয়া বাংলা-সাহিত্যকে নব জন্মদান করিলেন, আজ হয় ত সে পথে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের নর-নারী সব ভিড় করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু বঙ্কিমকে বুঝিতে হইলে বাংলার তখনকার পারিপার্শ্বিক সাহিত্যজগতের কথা ভাবিতে হইবে। বাংলা সাহিত্যের আকাশে তখনও "আন্তির কুয়া কুয়া কইছে", বাংলার সমাজে তখনও সদ্য বিধবাকে ধুতুরার ফল খাওয়াইয়া পাগল করিয়া বাঁশের খোঁচায় চিতায় পুড়াইয়া সতীকরা হইতেছে, বাংলার গ্রামে গ্রামে তখন অনূ্যন ।বিংশ-পত্নী-সৌভাগ্যবান্ কুলীন ব্রাহ্মণ একরাত্রে অষ্টমবর্ষীয়া হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায়-বৃদ্ধা অনূঢ়া বালিকার আইবুড়ো নাম ঘুচাইয়া পরলোকের সুব্যবস্থার নামে বিবাহ করিতেছে—; এই অসম্ভব বীভৎস জগতের মাঝখানে কোথা হইতে জোয়ারে আসিল—অপরূপ মানব-মানবীর দল; আয়েষা, কুন্দ, শৈবলিনী, কপালকুণ্ডলা, নগেন্দ্রনাথ, প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, মহেন্দ্র ইত্যাদি। বঙ্কিমচন্দ্রের দিকে আমরা চাহিয়া থাকি—কিন্তু দৃষ্টি আরো একটু ঘুরাইয়া ফেলিলে দেখিতে পাইব, কি ভয়ানক প্রাণহীন অন্ধকারের সমুদ্র! সেই অন্ধকার সমুদ্রের দিকে চাহিয়া মনে হয়, এই মহাজ্যোতি সূর্য্য কেমন করিয়া ঐ সমুদ্র মথিয়া উঠিল!

এই সমস্ত কথা বলিতেছিলাম, কেন না দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্ন-প্রয়াণকে বুঝিতে হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা রচিত হইয়াছিল পঞ্চাশ বৎসর আগে—রবীন্দ্র-সাহিত্যের পূর্ব্বে। বাংলা-ভাষা তখনও কিশোর-কবির মনে নীরবে নব-সৃষ্টির আশায় বসিয়াছিল, বাংলার কথায় ও সুরে তখনও সহজদেবতা ধরা দেন নাই। পঞ্চাশ বৎসরের সাধনার বলে দিগ্বিজয়ী কবি আজ বাংলা ভাষা ও ভাবের অঙ্গে যে অপূর্ব্ব নিপুণতা ও লীলার সঞ্চার আনিয়াছেন তখনকার দিনে ভাষার ও ভাবের সে সহজ মিলন ও তাহাদের অপূর্ব্ব লীলাময় গতি দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্ন-প্রয়াণে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, যেন তরুণ রবীন্দ্রনাথ স্বপ্ন-প্রয়াণের অঙ্গের আড়ালে লুকাইয়া আছেন। বাংলা ভাষা আজ যে নমনীয়তার অধিকারী হইয়াছে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে স্বপ্ন-প্রয়াণে তাহার সুস্পষ্ট সম্ভাবনা ছিল।

ভাষার ক্রমোন্নতির ফলে দেখা যায় যে, ভাষার অর্থের পরিসর ক্রমশ বাড়িয়া যায়। অল্প কথায় এমন ভাব প্রকাশ করা যায়, যাহার ভাব বহুদূর বিস্তৃত; অনেক সময় শব্দ এমন হইয়া ওঠে যে, সে তাহার অভিধানগত অর্থকে ছাড়াইয়া এক বৃহত্তর সূক্ষ্ম সত্তা গ্রহণ করে। শব্দ তখন মনোময় হইয়া ওঠে। তাহার অর্থ তখন অভিধানকে ছাড়াইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে এই মনোময় জগতে আনিয়াছেন। এই মনোময় জগতে শব্দ শুধু একটা ইঙ্গিত হইয়া ওঠে; সীমাবদ্ধ অক্ষরের ভাষা হৃদয়ের যে সব অসীম কামনা ও বেদনা তাহারই প্রতীক হয় এবং অর্থে যাহা বলিয়া বুঝাইতে পারে না ইঙ্গিতে তাহা বুঝায়। রবীন্দ্রনাথের এই ইঙ্গিতময়ী অপূর্ব্ব ভাষা দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণের মধ্যে পাই। দ্বিজেন্দ্রনাথই প্রথম এই ভাষা প্রয়োগ করেন। সেই সময়কার অন্যান্য কবিদের সহিত রবীন্দ্রনাথের যে স্পষ্ট প্রভেদ চোখে লাগে তাহা মনে হয় ভাষার এই ক্রমোন্নতির জন্য। হেমচন্দ্র অথবা নবীনচন্দ্রের ভাষা এই দূরপ্রসারী ইঙ্গিতময় সত্তা লাভ করে নাই।

সুদূর নগর গ্রামে বাজে দ্বিপ্রহর

অথবা—

মহাকবি আদিকবি—
ছন্দে উঠে শশি রবি
ছন্দে পুন অস্তাচলে যায়—

একেবারে রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ভঙ্গী! মনে হয় রবীন্দ্রনাথের—

"ছন্দে উঠিছে তারকা
ছন্দে কনক রবি—"

এই ভাষার সহিত দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষার সংযোগ আছে। স্বপ্ন-প্রয়াণের ভাষা অপূর্ব্ব। এই রকম সহজ লীলাময় ভাষার বাংলা সাহিত্যে আর কোন কাব্য লেখা নাই। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় বহু নব শব্দ দিয়াছেন ও বহু

শব্দে নব নব ভঙ্গী দিয়াছেন—দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ব্বেই সে কাজে হাত দেন।

অই মম তপ
অই মম জপ
অই চাঁদে উনমাদ বাসনা-জলধি।

অথবা—

আমরা যখন যাব বন-সামিয়ানা তল দিয়া ...”

ডাকিলে সাড়া দিবার নাহি-লোক!
নিশ্বাসিয়া ওঠে ঝাউ কত যেন হইয়াছে শোক!
শাখা-বাহু উদ্যমিয়া খেদায় আলোক্—

(রবীন্দ্রনাথ—"অরণ্য উদ্যত-বাহু করে হাহাকার")

অথবা—

গীত মাত্র পিয়া
রহে যেন জিয়া!
শুনিতে শুনিতে আঁখি উঠিল বাদলি’।

অন্যত্র—

এই বেলা পড় সরি; পরে বলে করো না আড়াল
ঝাট দিয়া ফেলি তারা-কুসুমের এসব জঞ্জাল,
আসিছেন প্রভু মোর ত্রিলোক-বাঞ্ছিত-দরশন

অথবা—কবির বিষয়ে বলিতে গিয়া সেখানে বলিয়াছেন—

চিরকাল তুমি অরণ্যের পাখী, থাকিবেও তথা
চিরকাল! বলিতেছি আমি সেই অরণ্যের কথা,
যে অরণ্য বাতাসের সনে মুখামুখি কথা কয়
ডরে না ঝড়ে ঝাপটে, দিগন্ত-প্রাচীরে বদ্ধ নয়... * *

এবং—

সন্ধ্যা না হইতে যবে—পুর্ণিমার প্রেম-পিপাসায়
পুর্ব্ব দিকে শশী
উঠি’ আছে বসি
ফুল কুড়াতেছি মোরা বকুল তলায়।

এই সমস্ত উদাহরণে দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষার অপূর্ব্ব ভঙ্গী ও সহজ সৌন্দর্য্য স্পষ্ট বোঝা যায়। লালনার রূপবর্ণনায় ও অন্যান্য স্থলে প্রায়ই কবি ভারতচন্দ্রের কথা মনে পড়ে। ভাষার স্বচ্ছন্দ গতির দিকে চাহিয়া মনে হয়, স্বপ্ন প্রয়াণের কবি যেন ভারতচন্দ্রের স্মৃতিকে বহন করিয়া আনিয়াছেন।

এখন স্বপ্ন-প্রয়াণের কথা বলা প্রয়োজন।

"জীবন-স্মৃতি”তে রবীন্দ্রনাথ এই কাব্য-সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "বড়দাদা তখন দক্ষিণের বারান্দায় বিছানা পাতিয়া সামনে ছোট ডেস্ক লইয়া স্বপ্ন-প্রয়াণ লিখিতেছেন। বড়দাদা লিখিতেছেন আর শুনাইতেছেন, আর ঘন ঘন হাস্যে বারান্দা ভরিয়া উঠিতেছে। * * * বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে তেমনি স্বপ্ন-প্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়ীময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই। বড়দাদার কবিকল্পনায় এত প্রচুর প্রাণ-শক্তি ছিল যে, তাঁহার যতটা আবশ্যক তাহার চেয়ে তিনি ফলাইতেন বেশী। তাই অনেক লিখিয়া ফেলিয়া দিতেন। সেইগুলি কুড়াইয়া রাখিলে বঙ্গসাহিত্যের একটা সাজি ভরিয়া তোলা যাইত। * * স্বপ্ন-প্রয়াণ যেন একটা রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ। তাহার কত রকমের কক্ষ, গবাক্ষ, চিত্র, মূর্ত্তি, কারুনৈপুণ্য। * *”

স্বপ্ন-প্রয়াণের যে কবি একদিন অমর্ত্ত্য লোকে কল্পনার প্রেমে বিমোহিত হইয়া মন্দাকিনীর সলিল-সিকতায় সহিত আপনার বেদনার অশ্রু মিশাইয়াছিলেন, সে কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বয়ং।

জগতে দুই শ্রেণীর কবি ও কাব্য দেখা যায়। একজনের কাব্যই জীবন, অপর জনের জীবনই কাব্য। দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবনখানি একখানি কাব্য—আদিম কবির সারল্যে ভরা, একান্ত জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত একখানি মধুর কাব্য! স্বপ্ন-প্রয়াণের নায়ক কবি কল্পনার প্রেমে বিমোহিত হইয়া তাহার হাতে ধরা দিবার জন্য জীবনখানি প্রদীপ-শিখার মত সারা রাত্রি ব্যাপিয়া একান্ত নির্ভরে জ্বালিয়া রাখিয়াছিল, ঠিক সেই রকম দ্বিজেন্দ্রনাথও সমস্ত জীবন মঙ্গলময় জ্ঞানের আরাধনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন—যে জ্ঞান তাঁহাকে এমন সুন্দর ও মহান্ এক অনুভূতি দিয়াছিল, যাহার সাহায্যে সত্যই তিনি জীবন দিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন—"সর্ব্বা দিশা মম মিত্রং ভবন্তু”—সমস্ত দিক আমার মিত্র হউক! "মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে,”—মিত্রের চক্ষু লইয়া আমরা দেখি।

শান্তি-নিকেতনের আমলকী-কুঞ্জের নিত্য-অভ্যাগত পরদেশী বিহঙ্গমরা আকাশ-যাত্রার অবসরে আর অভ্যর্থনার জন্য সেই পরম স্নেহময় গৃহস্বামীটিকে দেখিতে পাইবে না। নিত্য অভ্যস্ত চড়ুই-এর দল অন্ধ অভ্যাসের বশে বারে বারে আসিয়া ফিরিয়া যাইবে। তপোবন পরিত্যাগ করিয়া তাপস চলিয়া গিয়াছেন; তাপসের স্নেহ-মন্ত্র-সঞ্জীবিত সমস্ত নির্ব্বাক অরণ্য ব্যথিত হইবে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন বিশ্রাম করিতেন, তখন গণিতের কোনও গূঢ় তত্ত্ব লইয়া চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। সেই সময় তিনি বলিতেন, "এই সবে একটু বিশ্রাম করিতেছি।”

"অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও স্বেচ্ছায় তিনি দরিদ্র ছিলেন। পিতৃদত্ত মাসহারায় সবটাই জ্যেষ্ঠপুত্র দীপেন্দ্রনাথের হাতে যাইত, নিজে কিছুই রাখিতেন না।

তাঁর নিয়মিত আহার-বস্ত্রের কখনো অপ্রতুল হইত না। কিন্তু একটী কাম্যবস্তুর অভাব মধ্যে মধ্যে অনুভব করিতেন—সেটী লেখার জন্য ও বাক্স তৈরীর জন্য কাগজ। একদিন শুনি, জোড়াসাঁকোতে তাঁর চাকরকে কাকুতি-মিনতির স্বরে বলিতেছেন—"দীপুকে গিয়ে বলিস্ আজ যদি আমায় একটা দোয়ানি দেয়, আমি একখানা খাতা আনাই।" *

স্বপ্ন-প্রয়াণ লিখিয়া কবি যখন যাহাকে পাইতেন তাহাকেই শোনাইতেন। শ্রোতার জ্ঞানবুদ্ধির তারতম্যের কথা একেবারেই মনে থাকিত না।

"তিনি আমাদের (সরলা দেবী) শ্রোতা করে তাঁর স্বপ্ন-প্রয়াণ শোনাতেন, ভালো বুঝতে পারতাম না। তাতেই মজা লাগত। মুখ চেপে হাসি টিপে রাখতাম, বাইরে এসেই হেসেই সারা। একদিন আমাদের সঙ্গে তারা দাসীও শ্রোতৃবৃন্দের একজন ছিল। শুনতে শুনতে সে গড় হয়ে প্রণাম করলে। বড়মামা (দ্বিজেন্দ্রনাথ) উচ্চহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও কি? প্রণাম করছিস্ কাকে?' সে বল্লে, 'ঠাকুর-দেবতার নাম শুন্‌লে পেন্নাম কর্ত্তে হয় না'?"

স্বপ্ন-প্রয়াণের যাঁহারা ঠাকুর-দেবতা তাঁহাদের নাম করি—কল্পনা, মায়া, লালসা, কামনা, আনন্দ ইত্যাদি। অবশ্য ইঁহারাই জীবনের দেবতা। ইঁহাদের পাষাণ-দেউলে অহরহ মানব দলে দলে আহুতি দিয়া চলিয়াছে।

স্বপ্ন-প্রয়াণের রূপকের বাহ্য-অংশকে বলা যাইতে পারে, কবির সহিত কল্পনা দেবীর পরিণয়। স্বপ্ন-প্রয়াণে দ্বিজেন্দ্রনাথ একটী কবির সৃষ্টি করিয়াছেন, যে কবি বিশ্বের অন্তর-লোকের অধিষ্ঠাতা আনন্দময় পুরুষ।

সুপ্তিতে ডুবিয়া গেল জাগরণ
সাগর-সীমায় যথা অস্ত যায় জ্বলন্ত তপন

তখন স্বপ্ন আসিয়া কবির শিয়রে পদ্ম-কর বুলাইল। স্বপ্নের পদ্ম-পরশে কবি "অচেতন হইয়া চেতন লাভ করিল—ঘুমন্তে জাগিল।"

স্বপ্নের কৃপায়
অন্ধে আঁখি পায়

সেই স্বপ্ন-দৃষ্টির সাহায্যে কবি ছায়াপথ দিয়া স্বপ্ন-দেবীর সঙ্গে চলিয়াছেন। কোন্ কূলহীন পারাবারে কামচারী রথ চলিয়াছে কবি জানে না। সারথীও নির্ব্বাক। ইহা কবির বাস্তব-রাজ্য হইতে মনোরাজ্যে প্রয়াণ। সেখানে,

দলি স্বর্ণরেণু
চরে কামধেনু
কল্পতরু-ছায়া তলে রঙ্গে হাসে ধরা।

সেইখানে রহিয়াছে বিগত আনন্দের পৃথিবী। সেইখানে আদি-জননী মায়ার স্বর্গ-ভবনে কল্পনার সহিত কবির দেখা। তারপর কবি রসাতল ও স্বর্গ সমস্ত ঘুরিয়া দেখেন,—লালসা, কুৎসা, ঘৃণা, পাপ কি কি রকমে আপনার প্রতাপ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত রূপকের বর্ণনায় মানবী-ভাব এত সুন্দর ফুটিয়াছে যে, এখানে সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার পরিচয় দিতে গেলে রসহীন নীতি-কথার মত শোনাইবে। কবির কল্পনা-দেবীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থা, বিষাদপুরের দৃশ্য, লালসার রূপ ও কীর্ত্তি—এমন সরল ও সহজ, যে কখনই মনে হয় না যে, কোনও নীতির রূপক পড়িতেছি! এই সমস্ত ঘটনার উপর কাব্যের একটা সুন্দর আবরণ আছে যাহা পাঠ করিলেই প্রতীয়মান হয়। স্বপ্ন-প্রয়াণের শেষে নায়ক-কবি বিষাদে অধীর হইয়া বলিতেছেন,

কবি কহে, কাহারে ছুঁবিবে কেবা, সব পৃথিবীর
অই দশা নিরখিয়া মন মোর হয়েছে অধীর—
কিছুতে না হয় তৃপ্ত! কি আছে এ-ছার ভব-ধামে
আছে বটে প্রেম-রত্ন! কিন্তু কোথা! প্রেম শুধু নামে!
চাবি-বন্ধ হৃদয় সকলি প্রায়, দৃঢ়মুষ্টি কর!
পদ প্রসারিতে মানা চারিদিকে গণ্ডি-আঁকা ঘর।

কবির সমস্ত ভ্রমণের মধ্যে যে সমস্ত অন্যায় ও অত্যাচারের ছবি দেখিয়াছেন তাহার স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত হইয়া কবির চিত্ত দুলিয়া উঠিয়াছে। কোথাও—

এর অভিমান উঠে সকল হইতে উচ্চে চড়ি'
সাধ যায় চরাচর পদতলে যাক্ গড়াগড়ি
ও দাঁড়ায় কর-যোড়ে অত্যাচার-ভারে অবনত
যত ভার চাপাও ততই সহে বলদের মত।

এই লালসা আর হীন বাসনার জগৎ হইতে কবির বিষাদ-কণ্ঠ চায় সেই স্থান, যেখানে—

* * * হৃদয় সবার—
এক ছাঁচে ঢালা, কেহ নহে পর, এক বাসস্থান
সকল জগ-জনের; ক্ষুধা তৃষ্ণা সবার সমান।

আজ স্বপ্ন-প্রয়াণের স্বপ্ন-লোক ছাড়িয়া বিংশ শতাব্দীর জাগর বাস্তব-লোকে হিংসা আর লালসার সংগ্রামের শ্রান্ত অবসানে সেই প্রশ্ন উঠিয়াছে—

কোথায় সেই স্থান? মানব কি আবার মিলিবে না আপনার আদিগৌরবে? কাহার অন্তরে সেই মন্ত্র আছে, যার তেজে মানবের মহাযজ্ঞশালার দুয়ার আবার খুলিবে? জেনোয়ার মন্ত্রণা-সভায়? ভার্সেই কনফারেন্সে? লুকার্ণোর চুক্তিতে?

এ প্রশ্ন আজ পৃথিবীর উপরে চন্দ্র-সূর্য্যের মত দুলিতেছে। এ প্রশ্ন দুলুক্—কিন্তু স্বপ্ন-প্রয়াণের ঋষি-কবি তাঁর স্বপ্ন-কাব্যে কবিকেই ভার দিয়াছেন এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য। নায়ক-কবিকে সুসঙ্গ বলিতেছে—হে কবি, তোমার কণ্ঠে বিলাপের ধ্বনি কেন? তুমি অরণ্যের পাখী, তোমার মুখে বিলাপের ধ্বনি কি সাজে? তুমি চিরকাল অরণ্যের পাখী—যে অরণ্য বাতাসের সঙ্গে মুখামুখি কথা কয়, যে অরণ্য ঝড়-ঝাপটে ভয় করে না—দিগন্ত-প্রাচীরে বদ্ধ নয়—তুমি সেই অরণ্যের পাখী? তোমার কণ্ঠে বিলাপ-ধ্বনি? তোমার বাণীতে আছে অসাধ্য-সাধন মন্ত্র! তুমি আঁধার নিশীথে প্রভাত-সূর্য্যকে ডাকিয়া আন—দুরন্ত শীতে তোমার কুঞ্জ-ভবনে তুমি শিশিরকে বাষ্প করিয়া উড়াইয়া দক্ষিণ বাতাসের পথ করিয়া দাও—অসাধ্য-সাধন মন্ত্র তো তোমার কণ্ঠে!

এই অসাধ্য-সাধন মন্ত্র আজ ভারতের দিগ্বিজয়ী কবির তন্ত্রীতে বাজিতেছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথের বীণায় অগ্নি-মূর্ত্তি লইয়া উঠিতেছে—সে অগ্নির তেজে দিগন্তের অন্ধকার সমুদ্রের এ-পারে আর ও-পারের মাঝখানে মাঝে মাঝে এক আলোর স্বপ্ন-সেতু সৃষ্টির সাড়া পাওয়া যাইতেছে, আবার কখন তরল অন্ধকারের হিম-স্রোত আসিয়া পড়িতেছে। শুধু ঊর্দ্ধে সেই প্রশ্নটী

* শ্রীমতী সরলা দেবী।

একটা তারার মত জ্বলিতেছে—মানবের মহাযজ্ঞশালার দুয়ার খুলিবে কবে? *

সংবাদ।

স্মৃতিসভা। বিগত ২৬শে চৈত্র মঙ্গলবার শ্রদ্ধেয় ৺আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের স্মৃতিসভা কলিকাতা টাউনহলে হইয়াছিল। মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে বহু গণ্যমান্য লোকের সমাগম হয়। বর্দ্ধমানাধিপতি তাঁহার প্রারম্ভিক বক্তৃতাতে এই সভার কালবিলম্বের হেতু নির্দ্দেশ করিয়া বলেন যে, যদিও আশুবাবু দুই বৎসর পূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গের প্রতি অধিবাসী তাঁহার স্মৃতি সমানভাবে বহন করিয়া আসিতেছে। তাঁহার প্রতিভা ছিল সর্ব্বতোমুখী, আর ছিল শিল্প ও সঙ্গীতের উপর তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ; তাঁহার আবাস-নিকেতনে যাইলে উহারই প্রকৃষ্ট পরিচয় মিলিত। আশু বাবু ও তাঁহার পত্নী প্রতিভা দেবীর সুমিষ্ট ব্যবহারে সকলেই পরিতৃপ্ত হইতেন। এদেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক জাগরণের মূলে তাঁহাকে দেখিতে পাই। যাঁহারা মাতৃভূমির জন্য অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, ভারতের ভাবী ইতিহাস রচনার সময়ে, তাঁহাদের মধ্যে আশুতোষের নাম সমুচ্চ স্থান অধিকার করিবে। পরে বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিচারকরূপে আশুবাবুর কৃতিত্বের উল্লেখ করেন; এবং একথাও সাহ্লাদে উল্লেখ করেন যে, আশুবাবুর শিক্ষাদীক্ষা বিলাতে হইলেও ভারতবাসী বলিয়া তাঁহার আত্মসম্মানবোধ এক দিনের জন্যও তাঁহাকে পরিহার করে নাই। মিঃ বি. এল. মিত্র বলেন যে, আশুবাবু আইন ব্যবসায়ীগণের অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। তিনি শিক্ষিত বাঙ্গালীর আদর্শ ছিলেন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল বলেন যে আশুবাবুর সমুচ্চ চরিত্র সকলকে আকৃষ্ট করিত। বিজিত জাতির যে কোন রাজনৈতিক দাবী অর্থাৎ politics থাকিতে পারে না, এই কথা তিনিই সর্ব্বপ্রথম ঘোষণা করিয়া এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনকে আশুবাবু একটী নূতন পথে পরিচালিত করেন। তাঁহার সহিত কথোপকথনে উদার ভাব অন্তরে স্বতঃই জাগিয়া উঠিত। মিঃ টি. সি গোস্বামী বলেন যে, আশুতোষের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা অল্প পরিচয়ে আয়ত্ত করা সুকঠিন। এদেশের জাতীয় শিক্ষার সঙ্গে তাঁহার নাম ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। তিনি ঠিকই বুঝিয়াছিলেন যে এদেশের প্রদত্ত শিক্ষা দাসত্বভাবকে আরও বাড়াইয়া দেয়। শ্রীযুক্ত জে. এম সেন গুপ্ত ওজস্বিনী ভাষায় বলেন যে, আশুতোষ কর্ম্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। কি জাতীয় শিক্ষা, কি জাতীয় ব্যাঙ্ক, কি হিন্দুস্থান বীমা অফিস, কি লক্ষ্মী কটন মিল—এ সকলেরই সঙ্গে আশুবাবুর নাম বিজড়িত; এ সকলেরই মধ্যে তাঁহার কীর্ত্তি। তিনি অন্যের সঙ্গে মিলিয়া জাতীয়তার যে সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, আমরা সেই ভিত্তিরই উপর নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। তিনি যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, আমরা সেই পথেরই অগ্রযাত্রী পথিক মাত্র। তাঁহার সুস্নিগ্ধ জীবনের কথা আজ মনে পড়িতেছে। মধুর তাঁহার বাক্যবিন্যাস, মধুর তাঁহার ব্যবহার, মধুর তাঁহার জাগরণের আহবান, মধুর তাঁহার আনন্দপূর্ণ মূর্ত্তি এবং মধুরতম তাঁহার তাপদগ্ধ শেষ জীবনের নির্জ্জন বিশ্রামের ছবি। তিনি দেশের সমুচ্চ লোকবৃন্দের অন্যতম। Mr. W. C. Wordsworth ইউরোপীয়গণের প্রতিনিধিরূপে শিক্ষা ব্যাপারে আশুতোষের আন্তরিকতার কথা উল্লেখ করেন এবং ইহাও বলেন যে, আশুতোষের ভিতরে দৃঢ়তা ও নির্ভীকতার ভাব যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও তিনি সুবিবেচক, বিনয়ী, গঠনকারী এবং কর্ম্মী লোক ছিলেন।

আশুতোষের তিরোধানে এইরূপে আন্তরিক বেদনা প্রদর্শনের পরে বর্দ্ধমানাধিপতিকে সভাপতি করিয়া তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য একটি Committee বিগঠিত হইবার প্রস্তাব হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

বলা বাহুল্য যে শ্রদ্ধেয় আশুবাবু বহুদিন ধরিয়া আদিব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ছিলেন।

পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব। গত ২৫শে বৈশাখ শনিবার প্রাতঃকালে পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের পঞ্চষষ্টিতম সাম্বৎসরিক জন্মতিথি-উৎসব বোলপুর শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে তথায় এদেশের এবং বিদেশের বহু গণ্যমান্য লোকের সমাগম হইয়াছিল। বিশ্বভারতীর সুযোগ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় শঙ্খ ও ঘণ্টার মঙ্গল বাদ্যে শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে জন্মতিথির অনুষ্ঠানটী স্বস্তিবাচন ও শান্তিবাচন পূর্ব্বক যথারীতি সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। অনেকগুলি সময়োপযোগী সঙ্গীত গীত হইয়াছিল এবং সর্ব্বশেষে প্রচুর ভোজের আয়োজন ছিল। উৎসব রজনীতে আশ্রম-কন্যাকাগণ কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের নববিরচিত "নটীর পূজা" নামক নাট্যগ্রন্থের অভিনয় প্রয়োগকৌশলে সমাগত সম্মানাহ অতিথিগণের মনোহরণ করিয়াছিল। আমরা দেশের ও দশের শুভার্থী হইয়া ভগবানের নিকটে পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করিতেছি।

গার্হস্থ্য-সংবাদ।

শ্রাদ্ধ।—গত ২৭শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার প্রবীণ ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত আইচ মহাশয়ের সুযোগ্যা পত্নী ইচ্ছাময়ী দেবী তাঁহার নোয়াখালীর বাসভবনে পরলোকগত হইয়াছেন। তদুপলক্ষে গত ২৭শে চৈত্র শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত আইচ মহাশয় তাঁহার কুমিল্লা নগরীর বাসবাটীতে পুত্রগণসহ তদীয় পরলোকবাসিনী পত্নীর আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। এই অনুষ্ঠানটীর বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদ-সম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে যথারীতি দারুসামগ্রী উৎসর্গ করা

* "কল্লোল"—চৈত্র, ১৩৩২ সাল।

হইয়াছিল। ভগবান এই পুণ্যময়ী রমণীর লোকান্তরিত আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

শোক-সংবাদ।

৺কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত। বিগত ১৫ই চৈত্র সোমবার বঙ্গের কৃতী সন্তান সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত তাঁহার বালিগঞ্জের আবাস-নিকেতনে ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পিতা শ্রদ্ধেয় কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের ঘনিষ্ঠতম যোগ ছিল। তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে আদিব্রাহ্মসমাজের মাসিক সভায় দেখিতাম। পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন একবার ঢাকায় গিয়া আদিব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে তাঁহার একটি কন্যার বিবাহ দিয়া আসেন। তাঁহার রচিত একখানি ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তক আমাদের নিকটে আছে; উহার নাম ভাবসঙ্গীত। উহা তাঁহার সরল হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে পূর্ণ। সার কৃষ্ণগোবিন্দ ১৮৭৩ সালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তিনি ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি আপনার প্রতিভা গুণে রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই পদ অধিকার করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি Fishery Commissionএ নিযুক্ত হইয়া মৎস্যতত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকা পর্য্যটন করিয়া আসেন। ১৯০৭ সালে তিনি India Councilএর জনৈক সভ্য নিযুক্ত হন। বাঙ্গালীর মধ্যে তাঁহারই এই প্রথম অধিকারলাভ। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি উহা হইতে অবসর প্রাপ্ত হন। এইরূপে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের ৪২ বৎসর কাল রাজসেবায় অতিবাহিত হয়। ইহার পাঁচ বৎসর পরে সৈন্যবিভাগ সম্বন্ধে যে, Lord Eshers Commission বসিয়াছিল তাহাতেও তাঁহাকে কার্য্য করিতে হইয়াছে। কোন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা অর্থাৎ গবর্ণর হওয়ার অবসর তাঁহার শেষ জীবনে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু বাঙ্গালী বলিয়া হইতে পারেন নাই; অথচ তাঁহা অপেক্ষা জুনিয়ার সিভিলিয়ন আসামের শাসনকর্ত্তা হইয়া গেলেন। K, C, S, I এই উপাধি লাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। তিনি তাঁহার দক্ষতাগুণে কি দেশীয় কি বিদেশীয় সকলের শ্রদ্ধা-ভাজন হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার তিনটি পুত্র, সকলেই প্রতিভাশালী ও কৃতী। পাঁচটি কন্যা উপযুক্ত পাত্রের সহিত বিবাহসূত্রে গ্রথিত। তাঁহার অভাবে ব্রাহ্ম-সমাজে পরিচয় দিবার মত একটি মহাজনের বিলক্ষণ অভাব ঘটিল। ঈশ্বর তাঁহার সুশীতল ক্রোড়ে পরলোকগত আত্মাকে স্থান দান করুন।

৺নীলমণি দে। মান্যবর সিভিলিয়ান কে. সি. দে অর্থাৎ কিরণচন্দ্র দে মহাশয়ের সম্প্রতি পিতৃবিয়োগ হইয়াছে। ইঁহার পিতা নীলমণি দে স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের জামাতা ছিলেন। মিষ্টার দে আপনার শিক্ষা ও প্রতিভাগুণে রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর হইয়াছেন। তিনি নগ্নপদে ধুতি-পরিধানে চাদরে অর্দ্ধ-আবৃত দেহে আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবগণের দ্বারে গিয়া 'দায়' জানাইয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার এভাব আমাদের বড় মিষ্ট লাগিল। পরমেশ্বর পরলোকগত আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

৺যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। টাকীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার প্রখ্যাতনামা রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় গত ২৪শে চৈত্র বুধবার রাত্রিতে তাঁহার বরাহ-নগরের বাসভবনে হঠাৎ পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার বিশেষ কোন পীড়া হয় নাই। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অকস্মাৎ রুদ্ধ হওয়ায় তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র তেষট্টি বৎসর হইয়াছিল। টাকীর সুপ্রসিদ্ধ কায়স্থ জমিদার বংশের নাম বাঙ্গালায় চির-প্রখ্যাত। এই বংশেরই অন্যতম সুসন্তান স্বর্গীয় কালীনাথ মুন্সী, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির সহিত যুক্ত হইয়া 'ব্রহ্মসভার' প্রতিষ্ঠা করেন এবং দীর্ঘ দিন উহার ট্রাষ্টীরূপে কার্য্য করিয়া যান। যতীন্দ্রনাথ এই মহাত্মারই বংশধর। পিতামহের ন্যায় ব্রাহ্মসমাজের সহিত ইঁহার প্রত্যক্ষ যোগ না থাকিলেও ইনি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। যতীন্দ্র-নাথ স্বয়ং সুবিদ্বান্—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ বি-এল ছিলেন এবং আমরণ ছাত্রের ন্যায় অধ্যয়নশীল জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যে ইঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। বঙ্গসাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রের প্রতি ইঁহার প্রগাঢ় প্রীতি পরিলক্ষিত হইত। ইঁহার ফলে ইনি আজীবন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত সংযুক্ত ছিলেন এবং একবার পরিষদের বাৎসরিক অধিবেশনে দর্শনশাখার সভাপতি পদেও ব্রতী হইয়াছিলেন। স্বাদেশিকতার ক্ষেত্রেও ইঁহার প্রীতির যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। ১৩১২ সালের স্বদেশী আন্দোলনকে পল্লী অঞ্চলে প্রসারিত করিবার কার্য্যে ইঁহার যথেষ্ট প্রভাব ও প্রবন্ধ দৃষ্ট হইয়াছিল। বর্ত্তমানের খদ্দর আন্দোলনেও ইনি নিশ্চল ছিলেন না। সর্ব্ববিধ সাধারণ কর্ম্মে চিরদিন ইনি উৎসাহশীল ছিলেন। সর্ব্বোপরি ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি বিনয়-নম্র ব্যবহারে ইঁহার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য্য পরিলক্ষিত হইত। শোনা যায়, ইনি ইঁহার স্বজাতীয় কর্ম্মচারীদিগের সহিত নিত্য একসঙ্গে আহারে বসিতেন এবং আহার্য্য পরিবেশনে কোনওরূপ ইতরবিশেষ থাকিত না। এরূপ মহানুভব ব্যক্তির ঈদৃশ অকস্মাৎ মৃত্যু বাঙ্গালার দুর্ভাগ্যেরই পরিচায়ক। আমরা ইঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনদিগকে এই গভীর শোকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহার লোকান্তরিত আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

তত্ত্ববোধিনীর নিয়মাবলী।

গ্রাহক।

১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হইলেও সেই বর্ষের প্রথম হইতেই পত্রিকা লইতে হইবে।

২। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৵০ আনা। অসমর্থ, মহিলা ও ছাত্রদের জন্য ২৶০।

৩। অনিবার্য্য কারণ ব্যতীত পত্রিকা প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই প্রকাশিত হয়।

৪। তিন আনার ডাকটিকিট, নাম ও ঠিকানাযুক্ত খাম পাঠাইলে একখণ্ড পত্রিকা নমুনা স্বরূপ পাঠান হয়। হাতে হাতে নমুনা দেওয়া হয় না।

৫। গ্রাহকগণ অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলে ভি-পিতে পত্রিকা পাঠান হয়। অতিরিক্ত খরচ প্রায় ।০ চারি আনা লাগে।

৬। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্ব মাসের ২২শে তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে।

৭। বার্ষিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

৮। যিনি পাঁচ জন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিবেন তিনি একবৎসর বিনা মূল্যে পত্রিকা পাইবেন।

প্রবন্ধ।

৯। তত্ত্ববোধিনীতে ধর্ম্ম, ইতিহাস, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, জীবনী, সমাজ-সমস্যা, সাহিত্য, ভ্রমণ, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কল্যাণকর ও উন্নতিবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

১০। লেখক যতই নবীন হউন, রচনা প্রকাশোপযোগী হইলেই সাদরে গ্রহণ করা হয়। নবীন লেখকগণের নিকট হইতে আমরা প্রধানতঃ সরল ভাষায় লিখিত বিজ্ঞান (রসায়ন-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, প্রাণি-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিজ্ঞানের সর্ব্ববিধ বিভাগ) এবং অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, সমাজতত্ত্ব ও ভ্রমণসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাইবার আশা করি।

১১। রচনার সঙ্গেই উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প ও নামধাম-যুক্ত খাম দেওয়া থাকিলে রচনা (প্রবন্ধ বা কবিতা) মনোনীত হওয়ার সংবাদ অথবা অমনোনীত হইলে পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া যায়। তবে ডাকের গোলযোগে হারাইলে আমরা দায়ী হইব না।

১২। রচনাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

১৩। বিজ্ঞাপনদাতাগণ মনে রাখিবেন যে এই পত্রিকা ৮৪ বৎসর চলিতেছে, অথচ ইহার বিজ্ঞাপনের হার সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ ; এবং এই পত্রিকার এক পৃষ্ঠা অন্য পত্রিকার দুই পৃষ্ঠার সমান।

সাধারণ	১ পৃষ্ঠা	....	১০৲	প্রতিমাসে।		
„	১/২ „	....	৬৲	„		
„	১/৪ „	....	৪৲	„		
„	১/৮ „	....	২৲	„		
কভারের	১ম	পৃষ্ঠার		নিম্নভাগে	......	১০৲
„	২য়	„			......	১৫৲
„	„	„	অর্দ্ধেক		......	৮৲
„	৩য়	„			......	১২৲
„	„	„	অর্দ্ধেক		......	৭৲
„	৪র্থ	„	„		......	২০৲
„	„	„	অর্দ্ধেক		......	১০৲

১৪। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। যে মাসে মূল্য না পাওয়া যাইবে সে মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

১৫। এককালে এক বৎসরের বন্দোবস্ত করিয়া ৬ মাসের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২৫৲ টাকা, ৬ মাসের বন্দোবস্ত করিয়া ৪ মাসের মূল্য দিলে শতকরা ১২৲ টাকা এবং ৩ মাসের বন্দোবস্তে ২ মাসের অগ্রিম দিলে শতকরা ৬৲ টাকা কমিশন দেওয়া হয়।

১৬। পুরাতন বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে পূর্ব্ব নিয়ম বলবৎ রহিল।

১৭। এজেণ্ট হইলে টাকায় ।০ আনা কমিশন পাইবেন।

১৮। মূল্যাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে এবং বিনিময় ও সমালোচনার পুস্তকাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

আদিব্রাহ্মসমাজ
৫৫, আপার চিৎপুর রোড
কলিকাতা।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

একমেবাদ্বিতীয়ং

একবিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
জ্যৈষ্ঠ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৭।

৯৯৪ সংখ্যা　　　　১৮৪৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি ঃ একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিগতাব্দ ৫০২৭। সম্বৎ ১৯৮৩। খৃঃ ১৯২৬। শক ১৮৪৮। সাল ১৩৩৩।

বন্ধু-আমার !

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৫। জীবনলাভ।

বন্ধু ! আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা খেলিতে তোমার বড় ভাল লাগে—না ? তুমি মনে কর, গাছের আড়ালে ফুলের আড়ালে লুকাইয়া থাকিলে তোমাকে ধরিতে পারিব না ? সকল সময়ে তাহা খাটে না। যাক—লুকোচুরি খেলা এখন থাক। আজ এই পূর্ণিমা রাত্রে তুমি এসো—আমি তোমার সঙ্গে বেড়াই আর মনের কথা কই। আকাশের চাঁদ, দখিনে বাতাস, আম্রমুকুলের উন্মাদক সুবাস, শতবিধ ফুলের ও মাটির সুগন্ধ সমস্তই আমাকে পাগল করিয়া তুলিতেছে। তোমার বিরহে কাঁদিয়া কাটিয়া অনেক দিন গিয়াছে। এখন তোমাকে পাইয়াছি—লাবণ্যে স্বর্গমর্ত্ত্য ছাইয়া গিয়াছে ; এখন সর্ব্বত্রই বসন্তের বাতাস বহিতেছে ; এখন সকলই আনন্দময়, সকলই মধুময়। ধরণীর কাণায় কাণায় যেন শোভা উছলিয়া উঠিতেছে। সমস্ত জগত যেন নবযৌবনে ঢলঢল করিতেছে।

লুকোচুরি খেলিবার পূর্ব্বে তুমি যখন আমার কাছে বসিয়াছিলে, সেই সময়ে আমি শুভ্র সুগন্ধ ফুলের একটী মালা গাঁথিয়া রাখিয়াছি—আজ তোমার চরণপূজা করিয়া সেই মালা তোমাকে পরাইব বলিয়া। রাত্রি অনেক হইয়াছে। আমার ভালবাসা তোমার চরণে দিয়া সার্থক করিবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। আজ তোমার চরণ পূজা করিতে না পারিলে এমন অবসর আবার কবে আসিবে, কবে আবার এমন মিলন হইবে, তাহা বলিতে পারি না। তুমি আমার হৃদয়ের পূজা গ্রহণ কর—আমার ভালবাসার যদি এতটুকু নিদ্রিত থাকে, তবে তাহাও জাগিয়া উঠুক। ভালবাসার এ কি আশ্চর্য্য কথা—ব্যথা না পাইলেও সুখ, ব্যথা পাইলেও সুখ—সমস্ত ক্ষণই যেন নিজের প্রাণ তোমার হাতে তুলিয়া দিবার জন্য উন্মুখ ! এক মুহূর্ত্তের জন্য হয় তো তোমার দেখা পাইব—কিন্তু সেই এক মুহূর্ত্তেরই জন্য, যেন নিমেষের ভিতর কত সুদীর্ঘ সুদীর্ঘ বৎসর অনায়াসে কাটিয়া যায়। আমি তোমার ভালবাসায় ডুবিয়া গিয়া যখন তোমার জন্য কাঁদি, তখন তুমি হাস ; আবার আমি যখন সংসারসুখে মত্ত হইয়া হাসি, তখন তুমি আমার জন্য কাঁদ—ভালবাসার এ কি লীলাখেলা ! ভালবাসার তত্ত্ব পাইয়াছি—জীবন দিয়া জীবনলাভ।

৬। বিপথে।

বন্ধু গো ! তোমার বন্ধুর দুর্দ্দশা একবার দেখিয়া যাও। তোমাকে বারেক ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়াছিলাম বলিয়া আমার কি দশা হইয়াছে, একবার আসিয়া দেখ। আমি শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে এই পথের ধারে আসিয়া পড়িয়াছি—কোথায় আসিয়াছি, কিছুই তো বুঝিতে পারিতেছি না—

চারিদিকে কাঁটার বন। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আকুল হইয়া পড়িয়াছি। আমার এই কষ্টের সময় বন্ধু হে! তুমি কোথায় আছ? একবার এসো—আমাকে পথ দেখাও। তোমারই জন্য তো এই জীবন রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আর না—আমার এ জীবন রাখিতে আর ইচ্ছা করিতেছে না—বিস্বাদ—বিস্বাদ! কাহার জন্যই বা জীবন রাখিব? সকল ছাড়িয়া তোমারই পশ্চাতে চলিয়া আসিলাম; আর আজ কি না, দৈবাৎ একবার ভুল করিয়া একটুখানি এদিক ওদিক সরিয়া গিয়াছি—অমনি তুমি তোমার বন্ধুকে ছাড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেলে? এক আধবার ভুলভ্রান্তি করিলে সংসারে তো মার্জ্জনা নাই দেখিয়াছি; কিন্তু তোমার কাছেও যদি ভুলভ্রান্তির জন্য মার্জ্জনা না পাইব, তবে তোমাকে বন্ধু বলিয়া ধরার কি দরকার ছিল? তোমার বন্ধুকে যদি বাঁচাইতে চাও, তবে আর বিলম্ব করিও না—শীঘ্র আসিয়া দেখা দাও—পথ দেখাও বন্ধু—পথ দেখাও—এই কাঁটার বনে শত বিষাক্ত কীটের মধ্যে আর এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারি না।

৭। বিষাদ।

বন্ধু হে! তোমাকে হারাইয়া আজ আমি কি অবস্থায় এদিকে ওদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছি, তাহা তো তুমি দেখিতেছ। দেহ শতবিধ কণ্টকের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে। অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া আজ শ্রান্তচরণে ক্লান্তদেহে তোমার চরণতলে দুদণ্ডের জন্য আশ্রয় পাইব ভাবিয়া এই সুদৃশ্য বৃক্ষলতায় পরিশোভিত এবং সুগন্ধ রাশি রাশি ফুলে ফুলে ভরা এই বনের ধারে আসিয়া বসিয়াছি। এ সময়ে বন্ধু হে! তুমি আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাও? আমার প্রাণের উদ্বেলিত বেদনার তরঙ্গ কি তোমার হৃদয়ে পৌঁছিতেছে না? তোমার জন্য আমি এই যে পাগল হইয়া গিয়াছি, ইহাই দেখিতে কি তোমার বড় আনন্দ হয়? আজ কত দিন ধরিয়া তোমার আশাপথ চাহিয়া আছি। এই জগতে তোমার নাম লইয়া যেখানে যাই, সেই-খানেই যেন চারিদিকে উৎসবের খেলা চলিতে থাকে; কিন্তু প্রাণের বন্ধু! আজ এ কি! আজ যে দিকেই চাই, কেন আনন্দ-ফুটিতেই চায় না—হৃদয় যেন বিষাদে নিমগ্ন থাকিতে চায়—তোমার সংসারকে উদাসনয়নে দেখিতে চায়—যেন কোন কিছুতেই সত্যের ছাপ নাই—যেন সমস্তই একটা প্রকাণ্ড প্রহেলিকা! বন্ধু—বন্ধু! এসো-মুহূর্ত্তের জন্য এসো—আমার নয়নের জল মুছাইয়া দাও—আমাকে এই আকাশজোড়া বিরাট অন্ধকার হইতে রক্ষা কর; আমার প্রাণে আশা দাও যে, তুমি আমার নিত্যসঙ্গী হইয়া আছ—আমি অভয় প্রাপ্ত হই।

৮। আবির্ভাব সম্বাদে।

বন্ধু গো! মনে হইতেছে তুমি আমার কাতর ডাক শুনিয়াছ এবং তোমার এই দীনদুঃখী বন্ধুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছ। তুমি আসিতেছ—আমার জানিবার পূর্ব্বেই এই গাছ-পালা, এই বন উপবন, এই বনের পাখী, ইহারা জানিতে পারিয়াছে মনে হয়। তাই আজ সমস্ত বন উপবন ফুলে ফুলে ছাইয়া গিয়াছে; মলয় বাতাস ঝুক ঝুক প্রবাহিত হইয়া ধীরে ধীরে তোমারই গাত্রের সুগন্ধ বহন করিয়া আনিতেছে; তাহারই তালে তালে গাছপালা কচি কচি পাতার হাত পা নাড়িয়া কত না গ্রীবাভঙ্গীর সঙ্গে নৃত্য করিতেছে। তোমার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া প্রকৃতিদেবী আজ নব নব ফুলহার গাঁথিয়া তোমার চরণে উপহার দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। আমারও প্রাণের ভিতর কত নূতন ভাব, কত নূতন বাসনা উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে—মনটাকে যেন এই দেহের ভিতরে বন্ধ করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না। সমস্ত প্রাণটাই যেন আজ বাহির হইয়া আসিতে চাহি-তেছে—মনে হইতেছে, আজ যদি পাখীদের মত আমার ডানা হইত, তাহা হইলে তোমার এখানে আসিবার পূর্ব্বেই আমিই তোমার চরণে গিয়া আছ-ড়াইয়া পড়িতাম। বন্ধু! তোমার অভাবে আমার প্রাণটা শূন্য হইয়া গিয়াছিল। আজ তুমি আসি-তেছ শুনিয়াই আমার প্রাণটা আবার ভরিয়া উঠি-তেছে। তোমার পার্শ্বে আমি দুই মুহূর্ত্ত বসিতে পারিব, এবং তুমি আমার সখানুরূপে আমারই পার্শ্বে নিত্যসঙ্গী থাকিবে, এ আনন্দ আমি আর কাহাকে জানাইব? এসো—এসো বন্ধু! আর বিলম্ব করিও না—প্রাণ আমার উতলা হইয়া উঠি-

য়াছে—এসো—এসো—আর আমি স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেছি না।

বঙ্গে পঞ্চব্রাহ্মণ কয়বার আসেন ?

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আদিশূরের কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ কেন ?

বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে বোঝা যায় যে, আদিশূরের যশ ও কীর্ত্তি উজ্জ্বল আকারে অক্ষুণ্ণভাবে নামিয়া আসিবার অন্য যে কোন কারণ থাক না কেন, জীবনের শেষভাগে তাঁহা কর্ত্তৃক পুত্রেষ্টি যজ্ঞ উপলক্ষে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন যে তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। ইহা ঐতিহাসিক সত্য হউক বা নাই হউক, অন্তত প্রবল জনশ্রুতি এই যে, রাজা আদিশূর বঙ্গদেশে পঞ্চগোত্রের পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনাইয়া বাস করাইয়াছিলেন। আদিশূর তাঁহার রাজ্যকালের ভিতর শৌর্য্য বীর্য্য প্রভৃতি বিবিধ রাজোচিত গুণের বিশেষ পরিচয় দিয়া যে অনন্যসাধারণ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও সকল কুলগ্রন্থেরই সম্মত। কিন্তু আজ সে আদিশূরও নাই, তাঁহার সে রাজ্যও নাই। তথাপি আজও যে আমরা তাঁহার যশ কীর্ত্তন করি, তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ হইল বঙ্গদেশে পঞ্চ ব্রাহ্মণ সংস্থাপন। বঙ্গদেশে যে শাণ্ডিল্যপ্রমুখ পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণ, বলিতে গেলে, সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা ও প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, আদিশূরানীত ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণই তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। আজ কি পূর্ব্ববঙ্গে, কি পশ্চিম বঙ্গে, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রদিগের এত যে প্রতিপত্তি দেখিতেছি, ইহার সম্পূর্ণ না হউক, অনেকটা মূল হইতেছে ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের তপোবীর্য্য। তাঁহাদের গৌরব নষ্ট করিয়া আমরা দাঁড়াইব কোথায় ? কাজেই পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে গেলেই ঐ পঞ্চ মহাপুরুষকে যে রাজা এদেশে আনাইয়া যথাযুক্তরূপে বসতি করাইয়াছিলেন, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সেই রাজা আদিশূরেরও নাম যে কোন না কোন প্রকারে আমাদের স্মৃতিপটে জাগ্রত হইয়া উঠিবে, তাঁহারও যশ ও কীর্ত্তি যে আমাদের মধ্যে পুরুষানুক্রমে বিঘোষিত হইবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি।

রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের অভাব।

ইতিহাস বলিতে বর্ত্তমানে প্রধানত রাষ্ট্রীয় ইতিহাসই ধরা যায়। যে সকল গ্রন্থে সংগ্রাম, রাজ্যহরণ প্রভৃতি বর্ণিত থাকে, সেই সকল গ্রন্থই আজকাল আমাদের নিকটে সাধারণত ইতিহাসরূপে পরিচিত হয়। পাশ্চাত্যদিগের নিকটেই আমরা এই ধারণা প্রাপ্ত হইয়াছি। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের আগ্নেয় পর্ব্বত সংগ্রামের সর্ব্বসংহারক অগ্নি চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত করিতে আজও বিরত হয় নাই। কিন্তু এই ভারতভূমি হইতে বহুকাল যাবৎ ভগবান সংগ্রামের অগ্ন্যুদ্গার একপ্রকার নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়াছেন বলিলেও চলে। বর্ত্তমানে ভারতের এমনই অবস্থা যে, ভারতবাসী ক্ষাত্রবলের সফলতায় প্রতি হতাদর প্রকাশে বাধ্য হইয়াছে। ভগবানের যেন ইচ্ছাই নয় যে, আমরা আবার ক্ষাত্রবলের সহায়তায় পাশবিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হই। বহুকাল যাবৎ অহিংসাধর্ম্মের চর্চ্চায় অভ্যস্ত হইবার ফলে আজ সাধারণত ভারতবাসী ক্ষাত্রবল প্রয়োগে অনিচ্ছুক ; আবার, ভগবৎবিধানে আমাদের এমন অবস্থাও ঘটিয়াছে যে, ইচ্ছা করিলেও ক্ষাত্রবল প্রয়োগে আমাদের অধিকারই নাই। এই কারণে, আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের বড়ই অভাব ; যদি বা কোন গ্রন্থে রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের কোন উল্লেখ থাকে, তবে তাহাও স্পর্শমাত্রে।

সামাজিক ইতিহাসের অভাব নাই।

কিন্তু আমাদের দেশে সামাজিক ইতিহাসের বড় একটা অভাব ছিল না, বরঞ্চ প্রাচুর্য্যই ছিল বলিয়া বোধ হয়। দেশে দীর্ঘকালব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিলে যাহা হয়, তাহাই ঘটিয়াছিল—বঙ্গের ইতিহাসে সামাজিক ব্যাপারগুলিই প্রধান স্থান অধিকার করিয়া বসিল। আমাদের দেশে একটা সাধারণ সংস্কার আছে যে, পুরাণাদি এতই কল্পনাপূর্ণ যে, সেগুলির মধ্যে কোন প্রকার ইতিহাসের ধারা সন্ধান করিতে গেলে গোলোকধাঁধায় পড়িয়া যাইতে হয়। অনেকেরই মতে মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের ভারতের প্রকৃত ইতিহাস সংগ্রহের কোনই উপায় নাই। সুখের বিষয়, এই ভ্রান্ত সংস্কার ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইবার উপক্রম করিতেছে। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের

কথা, রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক ইতিহাসের যাহা কিছু মূল পুঁথি বা সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পাওয়া যাইত, তাহাও বর্গী, বিধর্ম্মী ও বিদেশী প্রভৃতির অত্যাচারে এবং অনেক স্থলে গৃহদাহ, জলপ্লাবন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্দ্দৈবের কারণে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, ইহা আমরা পূর্ব্বে আদিশূরকথায় বলিয়া আসিয়াছি। তদ্ব্যতীত, এখন বলাও অসম্ভব যে, কোথায় কোন্ তাম্রফলক বা প্রস্তরফলক ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদিগের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবার ইচ্ছায় বর্ত্তমানে আত্মগোপন করিয়া আছে। বিস্তর ইতিহাস, বিস্তর তাম্রফলক ও শিলালিপি বিলুপ্ত হইলেও এখনও যাহা পাওয়া যায়, তাহা হইতেই এদেশের ইতিহাস, বিশেষত সামাজিক ইতিহাস সংগ্রহ করা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহা আমরা মনে করি না। এই সকল উপকরণ অবলম্বনেই আমরা আজও আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহে সক্ষম হইয়াছি।

আদিশূর গৌড়পতি।

এই সকল ইতিহাস হইতে আমরা পাই যে, এক সময়ে রাজা অশোক প্রভৃতি পরাক্রান্ত অনেকগুলি বৌদ্ধ নৃপতির যত্নে ও চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল বন্যার মুখে বেদভিত্তি হিন্দুধর্ম্ম ভাসিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল। সম্বৎ দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি (বা খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে) কান্যকুব্জ প্রভৃতি দুই একটী রাজ্য ব্যতীত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তকে বৌদ্ধধর্ম্ম সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মগধরাজ্য ও গৌড়রাজ্য বিশেষভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। অনুমান হয় যে, আদিশূরের সময়ে বৌদ্ধগণের মধ্যে ধর্ম্মের নামে নানাবিধ অনাচার কদাচার প্রবেশ লাভ করাতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে বৈদিক হিন্দুধর্ম্মের একটা প্রবল প্রতিঘাত-তরঙ্গ উঠিয়াছিল; এবং সেই তরঙ্গের সূত্র অবলম্বনেই বৈদিক ধর্ম্মের একান্ত অনুরাগী বঙ্গাধিপতি আদিশূর বৌদ্ধ পালবংশীয় নৃপতিদিগের হস্ত হইতে গৌড়রাজ্য কাড়িয়া লইয়া গৌড়াধিপতিরূপে মূর্দ্ধাভিষিক্ত হন। আদিশূরের বংশই বৈদিক ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন, তাই বংশপ্রতিষ্ঠাতা শালবান রাজা কুলগ্রন্থে "স্বধর্ম্মপরিপালক" রূপে উল্লিখিত হইয়াছেন।

আদিশূরের পূর্ব্বেও এদেশে অনেক ব্রাহ্মণের বাস ছিল।

এদেশবাসী জনসাধারণের বিশ্বাস এই যে, রাজা আদিশূর ক্ষিতীশপ্রমুখ বা ভট্টনারায়ণপ্রমুখ যে পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, তাঁহাদের পূর্ব্বে কান্যকুব্জ প্রভৃতি বিদেশ হইতে কোনও ব্রাহ্মণের এদেশে আসিয়া বসবাস তো দূরের কথা, আগমনই ঘটে নাই। কেবল তাহাই নহে, ঐতিহাসিকগণ যেই আবিষ্কার করিলেন যে, আদিশূরের পূর্ব্বেও এদেশে বন্দ্যঘটী ও সাবর্ণ্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণের বাস ছিল, অমনি তাঁহারা স্থির করিলেন যে, আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়নের কথা সর্ব্বৈব কাল্পনিক *। আমরা ইহা স্বীকার করি না। বঙ্গরাজ্য ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গৌড়রাজ্য যেরূপ বহু পূর্ব্বাবধি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, তাহাতে দেশবিদেশ হইতে অন্যান্য লোকের ন্যায় বিভিন্নগোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগেরও বহুপূর্ব্বাবধি যাতায়াত মোটেই অসম্ভব ছিল না। হয়তো এই একটী কাকতালীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল যে, কোন শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাবধিই বন্দ্যঘটী গ্রাম পাইয়া সেখানে বাস করিতেছিলেন, এবং উত্তরকালে ভট্টনারায়ণের বংশধর আদিবরাহও রাজার নিকটে ঐ বন্দ্যঘটী গ্রামই লাভ করিয়া বন্দ্যঘটী গ্রামীণ হইয়াছিলেন। তাই বলিয়া আদিশূরের সময়ে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণের বঙ্গদেশে আগমন অস্বীকার করা যাইতে পারে না। আদিশূরের সমসময়ে বঙ্গদেশ একটী সুবৃহৎ রাজ্য ছিল এবং একে একে তাহার অনেকগুলি পরাক্রান্ত রাজাও হইয়াছিলেন। অনুমান হয়, বঙ্গদেশের অধিকাংশ প্রজা বৌদ্ধধর্ম্মের অনুরাগী হইলেও তাহার রাজারা বৈদিক ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া মধ্যে মধ্যে জাঁকজমকের সহিত যাগযজ্ঞ করিতে ভাল বাসিতেন। এই সকল যাগযজ্ঞ উপলক্ষে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে অনেক ব্রাহ্মণের আগমন যে ঘটিয়াছিল, তাহা অনেকটা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

কুলগ্রন্থে তিনবার পঞ্চব্রাহ্মণ আগমনের বিশেষ উল্লেখ।

ভারতের এক রাজার দেশ হইতে অপর

* গৌ, ব্রা, ৫৯পৃঃ।

রাজার দেশে, বিশেষত কান্যকুব্জ ও বঙ্গদেশের পরস্পরের মধ্যে যে অবাধ গতিবিধি ছিল, তাহার প্রমাণের জন্য আমাদিগকে অধিক দূর যাইতে হইবে না। ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত গ্রন্থে আছে, আদিশূর যখন যজ্ঞ করিবার অভিপ্রায় সভাস্থ ব্রাহ্মণদিগকে জানাইলেন, এবং তদুত্তরে ব্রাহ্মণগণ যখন বৈদিক যজ্ঞ করিবার অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন, তখন সভাস্থ একজন ব্রাহ্মণ নিবেদন করিলেন যে, তিনি ইতিপূর্ব্বে কান্যকুব্জে গিয়াছিলেন, এবং সেখানে ব্রাহ্মণদিগকে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে কৃতকার্য্য দেখিয়া অনতিপূর্ব্বেই বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন *। সাধারণতঃ এইরূপ অবাধ যাতায়াতের ব্যবস্থা থাকিলেও জনশ্রুতি ও তাহার মূল কুলগ্রন্থসমূহ আলোচনা করিলে অনুমান হয় যে, অন্তত তিনবার তিনটী সুবৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষে পাঁচ-পাঁচটী ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে বিশেষভাবে সমানীত হন।

রিক্ত।

গান।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল)

রিক্ত করিয়া লয়ে গো আমায়
তোমার সুধায় ভরিবে';
বারে বারে এই ব্যথা দিয়ে দিয়ে
সকল হৃদয় হরিবে।
তাইতো গো তুমি ধন জন মান
সব হতে কাড়ি' লইলে এ প্রাণ,
অশ্রুসলিলে ধুলে দুনয়ান—
আপন যে মোরে করিবে।
তাই ভাল মোর, তাই ভাল—
নয়নের জল—সেই ভাল,
তব সনে যদি দরশন মিলে
বিষজ্বালা আরো আরো ঢালো।
দাও দাও মোরে বেদনার দান ;
বেদনার রঙে রাঙা হোক্ প্রাণ
বক্ষশোণিতে বাহিরাক্ গান
তুমি সে হার কণ্ঠে পরিবে॥

রঙ্গালয় ও দেশোন্নতি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি. এস্ সি)

সকলেই বলিতেছেন যে এখন আমাদের দেশের ভয়ানক দুর্দ্দিন আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু এই দুর্দ্দিনে আমরা কি করিতেছি? বিগত যুদ্ধের সময়ে বিলাতের দুর্দ্দিনে সেই দেশের অনেক রঙ্গালয় ও আমোদপ্রমোদের ক্ষেত্র বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সকলেই তখন লড়াই করিতে ছুটিয়াছিল। আমরা তো বিলাতের নকলে এ দেশেও মহিলাগণকে রঙ্গালয়ে নামাইতে প্রবৃত্ত ; কিন্তু বিলাতের নকলে দেশের দুর্দ্দিনে কি রঙ্গালয়ের অভিনয় বন্ধ করিতেছি?—না, আরও নূতন নূতন রঙ্গালয় খুলিয়া দেশকে উন্নতির (?) পথে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতেছি—মহিলাগণকে নাট্যশালার মিথ্যার আসরে নামাইতে চাহিতেছি?—দেশের ভূমিলক্ষ্মী আজ আমাদের প্রতি কাতর নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু আমরা চলিয়াছি অভিনেত্রীর চটুল হাস্যে ও নৃত্যভঙ্গিমার মোহে অন্ধ হইতে। দেশের শিল্পবাণিজ্য আমাদিগকে কর্ম্মের ভেরীনিনাদে আহ্বান করিতেছে, কিন্তু আমরা চলিয়াছি আমোদপ্রমোদের পঙ্কিল স্রোতে ভাসিতে। আজ কোনও শিল্প বা বাণিজ্যের জন্য সামান্য টাকাও পাওয়া যায় না, কিন্তু সুবৃহৎ রঙ্গালয় স্থাপন ও পরিচালনের উপযোগী যথেষ্ট অর্থ দেখিতে দেখিতে সংগ্রহ হইয়া যায়। আজ আমরা শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিচিন্তায় আমাদের মস্তিষ্কের অপব্যয় না করিয়া রঙ্গালয়ের উন্নতিকল্পে প্রাণপাত করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছি। আমাদের উন্নতির আর বাকী কি? কোনও দরিদ্রকে একটী পয়সা দান করিতে হইলেও আমরা মূর্চ্ছা যাই, কিন্তু রঙ্গালয়ে দশ বিশ টাকাও অনায়াসে হাসিমুখেই ব্যয় করি।—এই সবই কি উন্নতির লক্ষণ নয়?

কেহ কেহ আবার বলেন যে রঙ্গালয় নাকি সত্যসত্যই আমাদের উন্নতির লক্ষণ। উহা নাকি আমাদের উন্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয় না হইলে এত দিন টিকিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু এই যুক্তি একেবারে ভিত্তিহীন। তাহা হইলে ত সর্ব্ববিধ নেশাই উন্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিতে হয় ; কারণ সুরা হইতে কোকেন পর্য্যন্ত যত মাদকদ্রব্য আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের সবগুলিই ত এ পর্য্যন্ত বেশ টিকিয়া আছে। অতএব স্পষ্টই বোঝা যায়, টিকিয়া আছে বলিয়াই যে সেটি প্রয়োজনীয় তাহা হইতেই পারে না। এ যুক্তি যুক্তিই নয়। জীবনের উন্নতির জন্য মাদক-

---

* অথ তৎসভোপবিষ্টঃ কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণোঽচিরমেব কান্যকুব্জদেশাদাগতো জগাদ"—ক্ষি বং ১পৃঃ।

দ্রব্যাদির ন্যায় রঙ্গালয়েরও কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। কিন্তু তথাপি লোকে তাহা জানিয়া অথবা না জানিয়া উহাতে আকৃষ্ট হইতেছে। কে তাহাতে বাধা দিবে? দেশের চিন্তাধারার পরিচালকগণ?—তাঁহারাই যে এ সকলের কর্ত্তা। তাঁহাদেরই কুদৃষ্টান্তে দিন দিন অশিক্ষিত দরিদ্র-গণও বিলাসিতার পথে গমন করিয়া স্বকীয় সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিতেছে। এ দেশের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ কেবল অজন্মা নয়, কেবল বিদেশে রপ্তানি নয়—কিন্তু বিলাসিতা, অমিতব্যয়িতা ও চরিত্রহীনতা। এই সমুদয় দোষেরই অন্যতম প্রধান কারণ রঙ্গালয়। আর দেশের তথাকথিত পরিচালকগণ ধ্বংসের মূল রঙ্গালয়-গমনের কুদৃষ্টান্ত দেখাইয়া দেশের কি অমঙ্গলই না ডাকিয়া আনিতেছেন! কে এ অমঙ্গলকে প্রতিরুদ্ধ করিবে?—শিক্ষিতসমাজ?—এদেশ রক্ষার পক্ষে শিক্ষিত-সমাজকে এক সময়ে প্রধান সহায় মনে হইত; মনে হইত, শিক্ষিতসমাজ আদর্শের উজ্জ্বল বর্ত্তিকা লইয়া অগ্রসর হইলে এদেশের সকলেই সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবে; **কিন্তু হায়, শিক্ষিতসমাজে এখন সারি সারি অনিষ্টকর আসক্তির বাতি জ্বালাইবার বহুল চেষ্টা** চলিতেছে। ক্ষণস্থায়ী আমোদের লোভে তাহারা অজ্ঞানীর ন্যায় দেশের কি ঘোর অনিষ্টই না করিতে-ছেন?—আর আমোদই বা কিসের?—যদি আজ কোন ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি এদেশে জন্মি-তেন তবে তিনি কি আজ আমোদে প্রমত্ত হইতেন?—না গভীর দুঃখের কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া নির্জ্জনে দেশের দুঃখের জন্য কাঁদিতে বসিতেন? কিন্তু আমরা আজ আমোদে মাতিয়া—লঘুভাবে ভুবিয়া ভাসিয়া বেড়াই-তেছি—দেশের উন্নতি অপেক্ষা 'আর্ট'এর উন্নতিসাধনে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি; তাহাতে দেশ যায় ত যাউক; ক্ষতি নাই!—চারুকলা বা আর্ট ত পরিপুষ্টি লাভ করিবে—তাহা হইলেই হইল!!!

যে দেশের চিন্তাধারার পরিচালকগণও লালসা সংযম করিতে পারেন না—যে দেশের নেতৃবৃন্দের অধিকাংশ বিলাসে বিমুগ্ধ, সে দেশের উন্নতি কোথায়? মহাজনের পথেই ত জনসাধারণ চলিবে। যে দেশে মহাজনরূপে কথিত ব্যক্তিগণও কামনার পঙ্কিলহ্রদে হাবুডুবু খান সে দেশে কিরূপে আশা করা যায় যে, জনসাধারণ দুর্নীতিকে বিষবৎ দেখিবে? এবং যে দেশের জনসাধারণ দুর্নীতি-নিমগ্ন, সে দেশের লোক সময় কোথায় পাইবে যে দেশের অন্নচিন্তার সমাধান করিবে? আমরা দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া বলিতেছি, যাঁহারা দেশকে বিলাসের পথে লইয়া যান, ধ্বংসের পথে লইয়া যান তাঁহারা যত বড়ই হউন, তাঁহারা দেশনেতা নন। তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি-যতই থাকুক না কেন, দেশ যেন তাঁহাদের অনুসরণ না করে। দেশবাসীর প্রধান কর্ত্তব্য, দেশের বর্ত্তমান বিলাস-স্রোতকে সবলে বাধা দেওয়া।

অনেকে আবার এই বাধা দেওয়াকে স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ মনে করেন। আশ্চর্য্য ধারণা ইহাদের স্বাধী-নতা সম্বন্ধে!! যে বিলাসিতার কারণে ঐতিহাসপ্রসিদ্ধ জাতিসকল ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, যে বিলাসিতার কুফল চাক্ষুষ ও যুক্তির সাহায্যেও প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাতে বাধা দেওয়া কি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ? মানুষের শরীর মন আত্মাকে বিলাসের অনলে ধ্বংস হইতে না দিলে কি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়, অথবা তাহার উন্মত্ততায় বাধা দেওয়া হয়? যদি কেহ আত্মহত্যা করিতে যায় অথবা নিজের ঘরে আগুন লাগাইতে চায়, তাহাতে বাধা দেওয়াও কি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ? ইহা যদি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হয় তবে আমরা সহস্রবার স্বাধীন-তায় এইরূপ হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করি। আমরা স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা বা উন্মত্ততা চাহি না।

শেষে আমরা একটী কথা বলিতে চাহি। ব্রাহ্মধর্ম্মকে হৃদয়ে উপলব্ধি করিলে কেহ আধুনিক রঙ্গালয়ে গমন সমর্থন করিতে পারেন কি না সন্দেহ। ব্রাহ্মধর্ম্মের, সকল সত্যধর্ম্মেরই মূল মন্ত্র ভগবানের সঙ্গে আত্মার যোগসাধন। রঙ্গালয়ে অভিনয় করা বা দেখা যে এই যোগসাধনে সহায়তা করে না, তাহা বিবেচক ব্যক্তি-মাত্রেই স্বীকার করিবেন। রঙ্গালয়েও গমন করিবেন, আর নিজেকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিবেন, অধিকাংশ স্থলেই ইহাও অসম্ভব। ব্রাহ্ম নামধারীদের মধ্যে কেহ কেহ রঙ্গালয়ে যান ও অভিনয় করেন বলিয়া ব্রাহ্মসমাজ যে উহার পক্ষপাতী ধরিতে হইবে এমন কোন কারণ নাই। বুঝিতে হইবে যে, তাঁহারা ব্রাহ্মবংশীয় হইলেও ব্রাহ্ম নন, বা ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করেন না। যিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করেন তিনি যে দেশ, যে কাল বা যে জাতিরই হউন না কেন তিনিই ব্রাহ্ম। 'জাতব্রাহ্ম' বলিয়া কথাই হইতে পারে না। যেমন ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, তদ্রূপ ব্রাহ্মের পুত্র হইলেই ব্রাহ্ম হওয়া যায় না। কার্য্য ও গুণ দ্বারাই ব্রাহ্মত্ব নিরূপিত হয়; কখনই জন্মদ্বারা ব্রাহ্মত্ব নিরূপিত হইতে পারে না। রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অথবা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে ভক্তি করিলেই ব্রাহ্ম হওয়া যায় না; ব্রাহ্মপদ্ধতিমতে বিবাহাদি অনুষ্ঠানমাত্র করিলেও ব্রাহ্ম হওয়া যায় না; কিন্তু যিনি সত্যের উপাসক, যিনি আপনাকে যোগসাধনের পথে অগ্রসর করেন তিনিই ব্রাহ্ম। আমি যদি দুষ্কর্ম্মের

অভিমুখে মনকে পরিচালিত করি তাহা হইলে আমি ব্রাহ্মবংশে জাত হওয়া সত্ত্বেও ব্রাহ্ম নহি। ব্রাহ্মত্ব বংশগত নহে কিন্তু কর্ম্মগত। ব্রাহ্মবংশে জাত হইয়াও, ব্রাহ্মপদ্ধতিমতে অনুষ্ঠানাদি করিয়াও যে ব্যক্তি মদ্যপানাদি দুষ্কর্ম করে, সে সেই সকল দুষ্কর্ম দ্বারাই সুস্পষ্ট প্রমাণ করে যে সে ব্রাহ্ম নহে; কারণ প্রকৃত ব্রাহ্ম কখন জানিয়া শুনিয়া দুষ্কর্ম্ম করিতে পারেন না। তবে দুষ্কৃতকারী যে ব্রাহ্মপদ্ধতিমতে অনুষ্ঠানাদি করে তাহা সে ব্রাহ্মধর্ম্ম মানে বলিয়াই যে করে তাহা নহে, কিন্তু সাংসারিক স্বার্থের ও সুখের অনুরোধেই সে ঐ কার্য্য করে। মুখে ব্রাহ্ম বলিয়া দাবী করিলেও সে ব্রাহ্ম নহে। রঙ্গালয়ে যদি স্ত্রীলোকের অংশ স্ত্রীলোকের দ্বারা অভিনীত না হয় তবে সে রঙ্গালয় যে টিকিতে পারে না, তাহা পরীক্ষিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, রঙ্গালয় সুনীতিপূর্ণ গ্রন্থ অভিনয় করিলেও সুনীতির পরিপোষক নয়। অতএব সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকামী ব্রহ্মপরায়ণ সাধুর পক্ষে রঙ্গালয় গমন কিছুতেই সমর্থন করা যায় না, কারণ তিনি কখনই দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষক হইতে পারেন না।

উপসংহারে বক্তব্য, এই বিপদের দায়িত্ব কোনও বিশেষ একটী সমাজের উপর ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইলেও চলিবে না। যে কারণেই হউক বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—এই বিপদ আমাদের দেশের—মাত্র কোনও বিশেষ সমাজের নহে। দেশের সকল হিতৈষী ব্যক্তির—সকল হিতৈষী সংবাদপত্রের কর্ত্তব্য, দেশকে এ বিপদের বিষয়ে সাবধান করিয়া দেওয়া। যাঁহারা ভারতমহিলাদের সম্বন্ধে বিদেশীয়দের অন্যায় ও অসঙ্গত উক্তিতে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন, আজ সেই উক্তিরই সত্যতা প্রতিপন্ন করিবার পথে যে সকল আয়োজন চলিয়াছে তাহার প্রতিবাদ না করিয়াও তাঁহারা কিরূপে স্থির আছেন? যে চারুকলা বা আর্ট স্পষ্টই বিজ্ঞাপনের সাহায্যে সাধারণকে লালসার কীট হইবার জন্য আহ্বান করে, যে রঙ্গালয়ের বিজ্ঞাপন দিবার জন্য বিদেশীদের উক্ত উক্তি অপেক্ষাও হীন ভাষা ও ভাব ব্যবহার করিতে হয়—সেই দেশবিধ্বংসী রঙ্গালয়ের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ না করিয়া শিষ্টসমাজসেবিত সংবাদপত্রসমূহ কিরূপে মৌন অবলম্বন করিয়া আছেন, বুঝি না। সংবাদপত্র-সম্পাদকগণ নাট্যশালা সম্বন্ধে এতটা নির্ব্বাক কেন? তাঁহারা কি রঙ্গালয়ের নিয়মিত ভক্তগণের অধিকাংশের অবনতি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াও নাট্যশালার অপকারিতা বুঝিতেছেন না, অথবা রঙ্গালয়সমূহ হইতে বিনা মূল্যে প্রবেশপত্র (pass) পাইয়া অভিনয় দর্শনের ক্ষণস্থায়ী সুখের লোভে দেশের এত বড় অমঙ্গল কার্য্যের বিরুদ্ধে সামান্যমাত্রও আপত্তি করিতে সাহস করিতেছেন না, অথবা 'বড়' 'বড়' লোক ইহার পৃষ্ঠপোষক বলিয়া ভয়ে সত্য সমালোচনা করেন না? যদি ইহাঁরা সেই ভয়েই সমালোচনা না করেন তবে বলিতে হইবে যে, এদেশের উদ্ধারের আশা এখনও বহুদূরে। যে দেশের সম্পাদকগণের লোকমতগঠনের সাহস নাই—যে দেশের সম্পাদকগণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে ভয় পান—যে দেশের সম্পাদকগণ 'গ্রাহক কমিয়া যাইলে অর্থহানি হইবে' এই ভয়ে সত্য কথা বলিতে সাহস করেন না, সেই অর্থলিপ্সু দেশে স্বরাজের চীৎকার বৃথা। অর্থলাভ হইলেই যদি অন্যায় কার্য্যেও উৎসাহ দেওয়া বা তাহার বিরুদ্ধে না দাঁড়ান দোষের না হয় তবে মীরজাফর প্রভৃতি আর কি দোষ করিয়াছেন? তাঁহারাও ত অর্থপ্রাপ্তির আশাতেই অন্যায় কার্য্যে উৎসাহ দিয়াছিলেন—অর্থলোভেই ত তাঁহারা জানিয়া শুনিয়াও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন নাই। আমরা আজ এই সকল সম্পাদককে ডাকিয়া বলিতেছি, মীরজাফর আদির পন্থা পরিত্যাগ করুন, অর্থলাভে দেশের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিবেন না। ক্ষণস্থায়ী অর্থের লোভে তাঁহারা যদি দেশের এই মহা অনিষ্টের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে ইতস্ততঃ করেন ত তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তাঁহাদের এই ইতস্ততঃ করার ফল কেবল যে দেশ ভোগ করিবে তাহা নহে—দেশের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের সন্তানসন্ততিকেও উহা ভোগ করিতে হইবে। দেশকে পরাধীন করিতে সাহায্য করায় মীরজাফর আদির সন্তানসন্ততি যে সেই পরাধীনতার দুঃখ ও কষ্ট হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে তাহা নহে—দেশের আর সকলের সহিত তাহাদিগকেও সমান ভাবেই পরাধীনতা-পাপের ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে। মনে রাখিবেন, অর্থলিপ্সু হইয়া আজ দেশের দুর্নীতির তালে তাল দিলেও ইহার পরিণাম ভীষণ হইবে। আজ দেশ বিলাসমোহে অচেতন হইয়া বুঝিতে পারিতেছে না—কোন্ পথে চলিয়াছে। কিন্তু কাল যখন মোহ কাটিয়া যাইবে—যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিবে—তখন যাহারা জানিয়া শুনিয়াও তাহাকে অবনতির পথে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছিল তাহাদের সে কিছুতেই ক্ষমা করিবে না—তাহা নিঃসন্দেহ। ফরাসিবিপ্লবের সময়ে যাহারা উন্নতির ছদ্মবেশে দেশকে অবনতিতে লইয়া যাইতেছিল, তাহাদের নামে বিপ্লবের মোহে মুগ্ধ ফরাসীগণ মাতিয়া উঠিত। কিন্তু যখন মোহ কাটিয়া যাইল—চেতনা ফিরিয়া আসিল তখন রোবস্পীয়র প্রমুখ সেই সকল ব্যক্তিকেই দেশকে অবনতির পথে লইয়া যাওয়ার দায়ে হত্যা করিবার জন্য ফরাসী জনসাধারণ উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই জন্যই আমরা সকল মান্যগণ্য লোককে আহ্বান করিয়া বলিতেছি, জানিয়া শুনিয়াও ক্ষণস্থায়ী অর্থের বা যশের বা

সুখের স্রোতে দেশের দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে ভয় পাইয়া অধর্মকে ডাকিয়া আনিবেন না। এখন কিছুদিন অধর্মের ফলে সুখ অর্থমানযশলাভ হইলেও ইহার পরিণাম ভীষণ। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন।

অধর্ম্মেণৈধতে তাবত্ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

অধর্ম্মের দ্বারা আপাততঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও কুশল লাভ করে, এবং শত্রুগণকে জয় করে কিন্তু শেষে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

সংহিতাকালীন আর্য্যাবর্ত্ত।

(শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য)

'সপ্তসিন্ধু' শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে, ত্রিসপ্তনদীপরিবেষ্টিত সিন্ধুনদের তীরভাগই ছিল প্রাচীনতম কালের আর্য্য-নিবাসকেন্দ্র। ঐতরেয়কে দেখিতে পাওয়া যায়—"যস্তেজোব্রহ্মবর্চ্চসমিচ্ছেৎ···প্রাঙ্ স ইয়াৎ, যোঽন্নাদ্যমিচ্ছেৎ···দক্ষিণা স ইয়াৎ, যঃ সোমপীথমিচ্ছেৎ ···উদঙ্ স ইয়াৎ" (১।২।২)। পূর্ব্বাদি দিক্‌সমূহের উল্লেখ করিলেই "কাহার পূর্ব্ব, দক্ষিণ বা উত্তর?"—এ প্রশ্নটি স্বভাবতঃ মনোমধ্যে উদিত হয়। আমরা মনে করি সিন্ধুই এখানে অভিপ্রেত অবধি। সিন্ধুর পূর্ব্ব, দক্ষিণ ইত্যাদি স্বীকারে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি রক্ষিত হয়। সিন্ধুর পূর্ব্বে যজ্ঞানুষ্ঠানবাহুল্যনিবন্ধন ব্রহ্মবর্চ্চসলাভের সহায়তা হইত, শতদ্রু-সিন্ধুসঙ্গমের দক্ষিণভূভাগে ভূমির উর্ব্বরতা ও জলবায়ুর নাতিশীতোষ্ণতাপ্রযুক্ত প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইত। পশ্চিমে অরণ্যপ্রাচুর্য্য হেতু বহু পশু দৃষ্ট হইত; এবং শতদ্রুসিন্ধুসঙ্গমের উত্তরাংশে শীতপ্রাবল্য হেতু সোমলতা উৎপন্ন হইত *। ঐতরেয়ালোচন গ্রন্থে পূজনীয় সত্যব্রত সামশ্রমী মহোদয় এই বিষয় বেশ স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রাচীনতম আর্য্যাবাসের মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিল সিন্ধুনদ। এই 'সিন্ধু'কে পাশ্চাত্য জাতিগণ স্বভাবতঃ 'হিন্দু' উচ্চারণ করিতেন, এবং ইহা হইতে 'হিন্দুস্তান' (সিন্ধুস্থান) শব্দের উৎপত্তি।

অতি খরস্রোতা রসা নামক সিন্ধুসঙ্গতা নদী ছিল এই আর্য্যাবাসের উত্তর সীমা। এ সম্বন্ধে শৌনক বলিয়াছেন—"কিমিচ্ছন্তী পণিভিরসুরৈর্নিগূঢ়া গা অন্বেষ্টুং সরমাং দেবশুনীমিন্দ্রেণ প্রহিতামবৃগুভিঃ পণয়ো মিত্রীয়ন্তঃ প্রোচুঃ, স তান্ যুগান্ত্যাভিরপিচ্ছন্তী প্রত্যাচষ্টে।" আমরা এখানে ইহার সায়ণ-ভাষ্যের মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিতেছি, —"ইন্দ্রপুরোহিত বৃহস্পতির গাভীগুলি বলনামক অসুরের অনুচর পণিনামক অসুরগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে বৃহস্পতির প্রেরণায় ইন্দ্র গাভী অন্বেষণের নিমিত্ত সরমা নামক দেবশুনীকে প্রেরণ করেন। তিনিও মহাস্রোতা নদী উত্তীর্ণ হইয়া গুপ্তস্থানে রক্ষিত গাভীগুলি দেখিতে পান। এদিকে পণিগণও এই সংবাদ পাইয়া সরমার সহিত মৈত্রীকরণে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা স্থির করেন······।" বস্তুতঃ এখানে পণি অর্থে বণিক্, সার্থবাহ। নিরুক্তকার বলিতেছেন—"পণির্বণিগ্ ভবতি" (২।৫।৩); "অসুরাঃ=বলবন্তঃ" (৩।২২)। প্রকৃতপক্ষে 'অসুর' অর্থে এস্থলে 'আর্য্যেতর' বুঝায় *। সরমা দেবশুনী নিশ্চয়ই অসাধারণ গুণবিশিষ্টা সুশিক্ষিতা কোন কুকুরী †। বলপুরীর গুহা আর্য্যশাসনবহিস্থ কোন পর্ব্বতপ্রদেশ বোধ হয়। অনার্য্য কর্ত্তৃক অপহৃত গাভী কুকুরী সহায়ে আর্য্যগণ কর্ত্তৃক পুনর্লব্ধ হইয়াছিল, ইহাই ইহার সারমর্ম। অপরাংশ রাজনৈতিক কাব্যমাত্র। ইহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় ঋক্‌সংহিতার দশমমণ্ডলে—

"কিমিচ্ছন্তী সরমা প্রেদমানড্ দূরে হ্যধ্বা জগুরিঃ পরাচৈঃ।
কাস্মে হেতিঃ কা পরিতক্ম্যাসীৎ কথং রসায়াঃ অতরঃ পয়াংসি।"
(১০।১০৮।১) ইত্যাদি

এই রসার উল্লেখ ঋক্‌সংহিতায় বহুস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়—"পিবেরিব প্ররসা অস্য পিন্বিরে দত্রাণি পুরুভোজসঃ" (৮।৪৯।২)। ইহা হইতে স্পষ্ট বোধ হয় যে, রসা গিরিসম্ভূতা। আরও মনে হয়, যথা সিন্ধুর পূর্ব্বভাগে অবস্থিত সপ্তনদীর সাধারণ নাম ছিল 'গঙ্গা'; 'সরস্বতী' যেমন একাই প্রাধান্যবশতঃ অন্য বহু নদীর বাচক ছিল; তেমনই সিন্ধুর পশ্চিমভূভাগস্থ সপ্তনদীর বাচক ছিল 'রসা'। অথবা, গঙ্গা যেরূপ নদীমাত্রেরই সাধারণ নাম, সরস্বতী যেমন নদীমাত্রেরই সাধারণ নাম, রসাও সেইরূপ ছিল। এইজন্য নিরুক্তকার গঙ্গা শব্দের নিরুক্তি করিয়াছেন 'গঙ্গা গমনাৎ'; সরস্বতী শব্দের নিরুক্তি করিয়াছেন 'সর ইত্যুদকনাম, সর্ত্তেস্তদ্বতী'; এবং রসা শব্দেরও নিরুক্তি করিয়াছেন "রসা নদী, রসতেঃ শব্দকর্ম্মণঃ।" সুতরাং রসা নদীসাধারণেরও বোধিকা। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে (৪।৪৯।২) "রসাঃ" বহুবচন দেখিয়া ইহাই বোধ হইয়া থাকে। অন্ততঃ রসার স্থিত সম্বন্ধে আমরা স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি—"তৃষ্টাময়া" ইত্যাদি নদীস্তুতির ষষ্ঠ ঋকে রসাকে সিন্ধুসঙ্গতা বলা হইয়াছে, আবার

* সোম শীতপ্রধানপ্রদেশেই উৎপন্ন হয়।

* "অসুর" শব্দের বৈদিক অর্থ দৈত্য নহে। অসুর শব্দ বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণের উদ্দেশে ব্যবহৃত হইয়াছে—ইহার অর্থ, শত্রুনাশক, প্রাণদায়ক, সর্ব্বশক্তিমান্ cp:—অহুরমজ্‌দা (আবেস্তা)। "দৈত্য" অর্থ অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

† অথবা Amazon শ্রেণীর কোন রমণী? তঃ সং।

(১০।২২।৪) ঋকে "সমুদ্রং রসয়া সহাছঃ" রসাকে সমুদ্রসঙ্গত বলা হইতেছে। সুতরাং দুটি রসার অস্তিত্ব এস্থলে স্বীকার করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। সমুদ্রসঙ্গতা এই দ্বিতীয়া রসা, আর্য্যাবর্ত্তের বহিস্থা, খোরাশান্ রাজ্যান্তর্গত আবেস্তাবর্ণিত 'রংহা' *। এই রসা তদানীন্তন আর্য্যাবাসের পশ্চিম সীমা ছিল এবং সরমা-পণিসংবাদ ইহার তীরেই সঙ্ঘটিত হইয়াছিল †।

অংশুমতী প্রভৃতি নদীগুলি আর্য্যাবাসভূমির অন্তর্গতা ছিল। অংশুমতী (ঋ, সং ৮। ৯৬। ১৩, ১৪, ১৫) যমুনাসঙ্গতা, দৃষদ্বতীর পূর্ব্বভাগে স্থিতা। অশ্মন্বতী (ঋ, সং, ১০। ৫৩। ৮), ঘর্ঘরার পশ্চিমে শতদ্রুর পূর্ব্বে উত্তর-দক্ষিণে প্রবহমানা বিনশনপ্রদেশীয়া। (ঋ, সং ১। ১০৪। ১, ২, ৩) ঋকে বর্ণিত শিফানামক নদী নিষধদেশীয়া, ইহা প্রথম ঋকে নিষদ শব্দের উল্লেখে স্পষ্টই অনুমিত হয়। (৬। ২৭। ৫, ৭) ঋক্‌দ্বয়ে বর্ণিত 'হরিয়ূপীয়া' ও 'যব্যাবতী' নামক নদীদ্বয় আফ্‌গানিস্থান মধ্যবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। ইহাদিগের আধুনিক নাম "হরিরুদ্‌" ও ঝোব (Zhob)।

ঋক্‌সংহিতায় ১০। ২৭। ১৭ মন্ত্রে যে অক্ষা নদীর নাম দৃষ্ট হয়, উহা আধুনিক Oxus বা মহাকবি বর্ণিত বক্ষু।

নদীস্তুতি মধ্যে যে শ্বেতী নদীর নাম পাওয়া যায়, তাহার অপর নাম অর্জ্জুনী, ইহা "সপ্তসিন্ধু" প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্বেতী শ্বেতপর্ব্বত হইতে উদ্ভূত; শতপথে দেখিতে পাই—প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যাঃ (১৪. ৬. ৮. ৯)। শ্বেতয়াবরী নামে অপর যে একটি নদীর নাম পাওয়া যায় (ঋ, সং, ৮। ৩৬। ১৮), তাহাও সম্ভবতঃ এই শ্বেতপর্ব্বত হইতে উদ্ভূত। সংহিতায় সরযূর নাম তিনবার দৃষ্ট হয়। এই সরযূ তক্ষশিলানগরীতলবাহিনী সিন্ধুসঙ্গতা নদী।

বাজসনেয়ি-সংহিতায় 'কাম্পিল্যবাসিনী' শব্দ (২৩, ১৮) দৃষ্টিগোচর হয়। এই কাম্পীল্যনগরী দশার্ণ প্রদেশের পূর্ব্বভাগে অবস্থিতা দক্ষিণপাঞ্চালের রাজধানী আধুনিক কম্পিলনগরী ‡। সাঙ্কাসা (সাঙ্কাশ্য?) উহার নৈঋতে, ইক্ষুমতী নদীতীরে অবস্থিত ছিল। উহা জনকভ্রাতা কুশধ্বজের রাজধানী বলিয়া রামায়ণে বর্ণনা পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব এখানে ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন। এবং এস্থলে ইহা মথুরার আঠার যোজন অগ্নিকোণে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। [Fa Hvan XVII ; 18 yojanas S. E. of Mathura], Cunningham উহাকে ইক্ষুমতীতীরস্থ সঙ্কিশ বা সঙ্কিশ বসন্তপুরের প্রাচীন নাম বলিয়া স্বীকার করেন। আমরা উহাই পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। Vincent Smith ইহাতে বিশ্বাস করেন না; তিনি বলেন, "The Elephant Pillar at Sankisa can not be the Lion Pillar seen by Yuan Chwang". He would look for it in the N. E. corner of the Ita district (Introd to Cun Geography,—S. N. Mazumdar Shastri M. A. P. R. S.—P. 706). বৃহদারণ্যকোক্ত (৩, ৩, ১) কপিপ্রদেশ ইহারই সন্নিকটে। হর্ষবর্দ্ধনের "মধুবন প্লেটে" উহার নাম পাওয়া যায় কপিত্থিকা, বরাহমিহির উহার নাম করিয়াছেন কাপিত্থক; য়্যাঙ্‌ চোয়াঙের গ্রন্থের টীকায় দৃষ্ট হয় যে উহারও প্রাচীন নাম Seng-ka-She (সাঙ্কাস্য)। নিরুক্তমধ্যে যে কপিষ্ঠলপ্রদেশের উল্লেখ পাওয়া যায় (৪. ১৪) উহা এই কপিপ্রদেশ বলিয়াই মনে হয়। অনতিপ্রাচীন পুরাণেতিহাস-বর্ণিত যক্ষু, বক্ষু, সীতা, গোবী প্রভৃতি নদীগুলি বৈদিক আর্য্যপরিব্রাজকগণের বিজ্ঞাত হইলেও তাঁহাদিগের বাসস্থানের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এমন কি, বিন্দুসরোবর, মানস-সরোবর, রাবণহ্রদ প্রভৃতিও ঐরূপ পরিচিত হইলেও প্রাচীনতম কালে আর্য্যনিবাসের বহির্ভুক্ত ছিল বলিয়াই বোধ হয়।

পাণিনি-সূত্র-গ্রথিত কাপিশনগর আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত। কানিংহাম সাহেব উহাকে কপিশা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উহার প্রকৃত নাম কাপিশী। উৎকৃষ্ট মধু ও দ্রাক্ষার জন্য স্থানটি বিখ্যাত (কাপিশায়নী সুরা, কাপিশায়নী দ্রাক্ষা, কাপিশায়নং মধু)। সুরার উল্লেখ পাণিনিসূত্রে না থাকিলেও অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায় *। "Y. Ch's Ka-pi-shih also gives the same sound and is nearer to the original than the classical forms of K[illegible]isa' †,

ঋকসংহিতায় [illegible] , হয়—

", [illegible] দযন্তি

[illegible] [illegible]ানাঃ।

---

* বিশ্বকোষ দ্রষ্টব্য।

† ইহা প্রাচীনতম আর্য্যাবাসের সীমা, পরবর্ত্তী সংহিতাকালে ইহা আরও পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়াছিল।

‡ Kampilya (Mod. Kampil in Forokhabad dist, U. P.) was the capital of south Panchala......Panchala raughly corresponds to Budaon, Furrukhabad and the adjoining districts of U. P.—(Introduction to Cunningham's Ancient Geography of India P, 704-5) - S. N. Mazumdar.

* পা. সূ. ৪. [illegible] কৌ অ. শা. ২. ২৫.

† I. C. A. G. P 671.

সোমস্যেব মৌজবতস্য ভক্ষো
বিভীদকো জাগৃবির্মহ্যমচ্ছান্ ॥”—(১০।৩৪।১)

ইহার অর্থ লইয়া অনেকে অনেক গোলমাল করিয়াছেন। সায়ণ ইরিণ শব্দের অর্থ করিয়াছেন আস্ফার; অন্যত্র তিনি ‘ইরিণ’ শব্দের অর্থ উষর প্রদেশ, নিম্নণতটাকদেশ ইত্যাদিও করিয়াছেন। Macdonell সাহেব অর্থ করিয়াছেন ‘diceboard’ এবং রমেশচন্দ্র দত্ত ‘ছক’ বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। যাস্ক ব্যাখ্যা করিয়াছেন—‘ইরিণং নির্ঋণমৃণাতেরপার্ণং ভবতি অপবতা অস্মাদোষধয় ইতি বা।” দুর্গাচার্য্য ইহার টীকা লিখিবার সময় বলিয়াছেন—“ইরিণে বর্ত্তমানাঃ নিগতর্ণে আপ্লুবকস্থানে বর্ত্তমানা; ন হি তত্র পুত্র-পৌত্রানুগমৃণং ভবতি।” সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় যাস্কের প্রথম অর্থ স্বীকার করিয়া “ইরিণে, ইরাণ নামক পারস্যদেশে” এই অপূর্ব্ব অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। এবং ইহার সমর্থনরূপে দুর্গাচার্য্যের উক্তি স্বীকার করিয়া বলিতেছেন, “তদ্দেশীয়ানাং হি ভারতীয়ানামিব পুত্রপৌত্রাদিষ্বপি পিতৃপৈতামহমৃণং ন সংক্রমতে।..মূজবান্ পর্ব্বতস্তু কৈলাসগিরেঃ পশ্চিমস্থোঽদ্যাপি রাজতে।” (ঐতরেয়ালোচন, পৃঃ ৩৫)। অতএব তাঁহার অনুমানে মূজবান্ পর্ব্বত ও ঈরাণপ্রদেশ বৈদিক আর্য্যাবাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অথর্ব্ববেদের পঞ্চম কাণ্ডে দ্বাবিংশতিতম সূক্তের তৃতীয় ঋকে পরুষ নামক জনপদের, চতুর্থে মহাবৃষপ্রদেশের, পঞ্চম এবং সপ্তমে মূজবৎ প্রদেশ ও বহ্লিকদেশের এবং চতুর্দ্দশে অঙ্গমগধমূজবৎ গন্ধারী প্রভৃতি দেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এবং এগুলি সমস্তই অনার্য্যবাসস্থল রূপে ঐ সময়ে পরিগণিত হইত সন্দেহ নাই, অন্যথা তক্মস্থাপন লইয়া বিশেষ বিরোধ উপস্থিত হয়। উক্ত সূক্তের একটি মন্ত্রে—

“গন্ধারিভ্যো মূজবদ্ভ্যোঽঙ্গেভ্যো মগধেভ্যঃ।
প্রৈষ্যন্ জনমিব শেবধিং তক্মানং পরিদদ্মসি ॥”

আথর্বণগণের যে আর্য্যাবাসমধ্যে তক্মস্থাপন অভিপ্রেত ছিল ইহাও সঙ্গত মনে হয় না। সুতরাং এরূপ ব্যবহার যে অনার্য্যজুষ্ট প্রদেশেই বর্ত্তমান ছিল সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। কিন্তু “সপ্তসিন্ধু” প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে, গান্ধার (কান্দাহার) ও পরুষ (পেশাবর) আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্ভূত ছিল, সুতরাং অথর্ব্ববেদের প্রামাণ্যে ইহাদিগকে অনার্য্যনিবাস বলা যায় কিরূপে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, ঋক্ সংহিতার সময় যে প্রদেশ আর্য্যজুষ্ট ছিল, অথর্ব্বসংহিতার যুগে (উক্ত মন্ত্রদ্রষ্টার সময়ে) তাহা যে অনার্য্যসেবিত হইয়া দাঁড়ায় নাই তাহা কে বলিবে? বেদ এক, অখণ্ড, অদ্বিতীয়, অপৌরুষেয় হইলেও মন্ত্রসমূহের সূক্ষ্মাকারে পরমেশ্বরে অবস্থিতি হইতে দ্রষ্টা ঋষিগণের সহায়ে একই সময়ে যুগপৎ স্থূলরূপ প্রাপ্তি ঘটে নাই। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মন্ত্র সেই বিশেষ যুগের বিশেষত্ব দ্বারা পরিশোভিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল (Revelation) *। সুতরাং ঋঙ্মন্ত্রে ও আথর্বণ মন্ত্রে বিরোধ হইবার আশঙ্কা নাই।

ঋক্সংহিতা পাঠে জানা যায় যে, মূজবান্ পর্ব্বতে উৎকৃষ্ট সোম পাওয়া যাইত; কিন্তু এতদ্ব্যতীত উহা যে আর্য্যসাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল তাহার কোনই প্রমাণ নাই। পরন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখা যায় যে, সোম অনার্য্যগণের অধিকারেই ছিল; মহাবৃষ প্রদেশসম্বন্ধেও এই কথাই বলা যায়। শতপথব্রাহ্মণে (১২।৩।৩) যদিও শ্বেত পর্ব্বতের পশ্চিমস্থ বহ্লিক প্রদেশের আর্য্যাবাসত্ব প্রমাণিত হয়, তথাপি অথর্ব্বসংহিতাকালে উহাকে অনার্য্যনিবাস বলাই সঙ্গত। কালভেদে অবস্থাভেদ এসকল স্থলে অবশ্য স্বীকার্য্য। অঙ্গরাজ্য ত মাত্র দুর্য্যোধনাদির সময় হইতে আর্য্যাবাসে পরিণত হয় †। অনার্য্যাবাস বলিয়া মগধের নিন্দা ঋক্সংহিতায় দৃষ্ট হয়—

“কিং কৃণ্বন্তি কীকটেষু গাবো
নাশিরং দুহ্রে ন তপন্তি ধর্ম্মম্।” (৩।৫৩।১৪)

নিরুক্তকার ইহার অর্থ করিয়াছেন—“কীকটো নাম দেশোঽনার্য্যনিবাসঃ।” (৬—৬—৪) এই কীকটই মগধ। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ স্মৃতিবচন আছে—

“কীকটেষু গয়া পুণ্যা, পুণ্যা নদী পুনঃপুনা।
চ্যবনস্যাশ্রমং পুণ্যং পুণ্যং রাজগৃহং বনম্ ॥”

গয়াদি স্থান মগধের অন্তর্গত।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, মূজবান্ পর্ব্বত আর্য্যাবাসের অন্তর্ভুক্ত হউক বা না হউক, উহা তদানীন্তন আর্য্যনিবাসের সীমা (উত্তরসীমা) বলিয়া পরিগণিত হইত। এই জন্য বাজসনেয়িসংহিতায় দৃষ্ট হয়—“তেন পরো মূজবতোঽতীহি” (২। ৬১)। রুদ্র-নামক মৃত্যুদেবতার মূজবানের পরপারে গমনের প্রার্থনা দেখিয়া ইহাকেই এই নববিস্তৃত আর্য্যাবাসের উত্তর সীমা বলিয়া অনুমান করা হইয়া থাকে।

সুতরাং সংহিতাকালীন আর্য্যাবর্ত্তের চতুঃসীমা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া আমরা বলিতে পারি যে—

আধুনিক এসিয়ামাইনর উহার পশ্চিম সীমা ‡ অনুগঙ্গ

---

* ভবিষ্যতে সামর্থ্য ও অবসর থাকিলে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিতে বাসনা রহিল।

† “অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃসংস্কারমর্হতি ॥”
ইহার আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

‡ সামশ্রমী মহোদয়ের “ইরিণ অর্থে ঈরানপ্রদেশ” এই অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা স্বীকার না করিলেও পারস্যের কিয়দংশ ও মেসোপোটেমিয়া প্রভৃতি আধুনিক ভূভাগ তৎকালে যে আর্য্যাবাসের অন্তর্ভূত ছিল তাহার অন্য প্রমাণ পাওয়া যায়। (vide “সপ্তসিন্ধু”, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন, ১৩০১)।

প্রদেশ পূর্ব্বসীমা, সিন্ধুসাগরসঙ্গম উহার দক্ষিণসীমা ও মুঞ্জবান্ পর্ব্বত উহার উত্তরসীমারূপে অবস্থিত ছিল। ইহার পরে আর্য্যাবাস কিরূপে আরও বিস্তৃতিলাভ করিল তাহা অন্য প্রবন্ধে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ)

হঠাৎ নবাব এই প্রহসনের আখ্যানভাগ সংক্ষেপে এই। কোনও দোকানী হঠাৎ কিছু ধনলাভ করিয়া বড়লোকের ন্যায় চলিতে আরম্ভ করে। তাহার দুহিতা এক দরিদ্র যুবাকে ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু দারিদ্র বলিয়া সে কিছুতেই সেই যুবার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিতে সম্মত হইল না। তখন ঐ যুবা কতিপয় বন্ধুর সাহায্যে তুর্কের নবাব সাজিয়া ছদ্মবেশে তাহাকে প্রতারিত করিল এবং ধনী জামাতা হইবে এই লোভে দোকানী তখন তাহার কন্যাকে সেই যুবার হস্তে সম্প্রদান করিল। বলা বাহুল্য এই গ্রন্থখানিতে প্রচুর হাস্য রস আছে এবং ইহা পরবর্ত্তী বহু প্রহসনের আদর্শ স্বরূপ হইয়াছিল।

ব্যবসায়বাণিজ্য ও ষ্টীমার পরিচালনা।

এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিছুদিন তাঁহার ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী কংগ্রেসের বিখ্যাত কর্ম্মী জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয়ের সহযোগে পাটের ব্যবসায় করিয়াছিলেন। পরে উহা বন্ধ করিয়া তিনি শিয়ালদহে কিছুদিন নীলের চাষ করেন। ব্যবসায়ে বেশ লাভ হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই নীলের বাজার খারাপ হওয়াতে তিনি এই ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দেন।

এই সময়ে একদিন 'এক্সচেঞ্জ গেজেটে' এক বিজ্ঞাপন দেখিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মধ্যাহ্নে নীলামে গেলেন এবং বাটি ফিরিয়া আসিয়া খবর দিলেন যে, সাত হাজার টাকা দিয়া তিনি একটি জাহাজের খোল কিনিয়াছেন। ইহার উপর এঞ্জিন জুড়িয়া কামরা প্রস্তুত করিয়া একটা সম্পূর্ণ জাহাজ প্রস্তুত করিতে হইবে। বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর মধ্যে তিনি অগ্রণী হইয়া প্রথম ষ্টীমার পরিচালনা করিবেন। আকাঙ্ক্ষায় তিনি মাতিয়া উঠিলেন এবং সুদক্ষ য়ুরোপীয় এঞ্জিনিয়ারদিগের তত্ত্বাবধানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলি কেন বাঙ্গালীর—প্রথম ষ্টীমার "সরোজিনী" কিছু দিনের মধ্যেই প্রস্তুত হইল; এবং সুনিপুণ ফরাসী পোতাধ্যক্ষের দ্বারা পরিচালিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিপুল অর্থব্যয়ে "বঙ্গলক্ষ্মী", "স্বদেশী", "ভারত" এবং "লর্ড রিপণ" নামে আরও কয়েকখানি ষ্টীমার ক্রয় করেন। এই সকল জাহাজ খুলনা এবং বরিশালের মধ্যে যাত্রী লইয়া গমনাগমন করিত এবং সময়ে সময়ে কলিকাতাতেও বাণিজ্যদ্রব্য বহন করিয়া আনিত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ষ্টীমার পরিচালনা কার্য্য আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে 'ফ্লোটিলা কোম্পানী' নামক এক য়ুরোপীয় কোম্পানী ষ্টীমার পরিচালনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল উভয় দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে লাগিল।

বাঙ্গালীর দেশাত্মবোধ তখন জাগরিত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে সর্ব্বত্র স্বদেশানুরাগী সজ্জনগণ 'স্বদেশী জাহাজের উন্নতির জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন এবং সংকীর্ত্তন, বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা দেশবাসীকে বিদেশী জাহাজে আরোহণ করিতে নিষেধ করা হইতে লাগিল। "বালকে" প্রকাশিত এবং 'প্রবন্ধমঞ্জরী'তে পুনর্মুদ্রিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'বরিশালের পত্র' হইতে কিয়দংশ এই স্থানে উদ্ধারযোগ্য :—

"তুমি অবশ্য জান এখানে আমার যেমন জাহাজ চলবে তেমনি ফ্লোটিলা কোম্পানীরও জাহাজ চলবে। আমাদের উভয়ের মধ্যে খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ফ্লোটিলা কোম্পানীর অনেক খরচপত্র লোকজনের ব্যয়, কিন্তু তারা প্রায়ই যাত্রী পায় না। অধিকাংশ যাত্রী আমাদের জাহাজে যায়। তাদের বিস্তর ক্ষতি হচ্চে তবু তারা সমান নিয়মিত ভাবে জাহাজ চালাচ্চে—যত্নের একটু ত্রুটি কিম্বা শৈথিল্য করে না; আর তারা প্রকাশ্যভাবে বলে—বাঙ্গালীর অধ্যবসায় নাই, তারা আমাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে কতদিন জাহাজ চালাতে পারবে? এখানে আমাদের জাহাজ যাতে স্থায়ী হয় তার জন্য এখানকার লোকের, বিশেষতঃ ইস্কুলের ছাত্রদের অপরিসীম উৎসাহ ও যত্ন। এমন উৎসাহ আমি কখন দেখিনি, তাদের ভাব দেখে চমৎকৃত হতে হয়। প্রত্যহ খুব ভোরে আমাদের জাহাজ এখান থেকে যাত্রী নিয়ে খুলনায় যায় ফ্লোটিলা কোম্পানীর জাহাজও সেই সময় যায়। পাছে আমাদের জাহাজে লোক না গিয়ে প্রতিপক্ষর জাহাজে যায়, এই জন্য কতকগুলি ভদ্রলোক ও স্কুলের ছাত্র রাত্রি ৪টার সময় উঠে দলবদ্ধ হয়ে উৎসাহের সহিত জাহাজের ঘাটে প্রত্যহ উপস্থিত হন ও যদি কোন যাত্রী প্রতিপক্ষের জাহাজে যেতে চায়, তাকে অনেক প্রকার বুঝিয়ে এমন কি, পায়ে পর্য্যন্ত ধরে ফিরিয়ে আনেন—যেখানে জালি বোটে করে প্রতিপক্ষের জাহাজে লোক উঠছে সেখান পর্য্যন্ত গিয়ে তাদের বুঝাতে থাকেন—'আমাদের কথাটি একবার শুনুন, তারপর যে জাহাজে ইচ্ছা হয় যাবেন। আপনারা বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর জাহাজ থাকতে কেন

আপনারা ইংরাজদিগের জাহাজে যাবেন.? দেশের টাকা দেশে থাকে এটা কি প্রার্থনীয় নহে? প্রতিপক্ষের জাহাজে স্বদেশীয়দিগের প্রতি কুব্যবহার করা হত, অপমান করা হত,—আমাদের নিমন্ত্রণেই আমাদের আহ্বানেই ঠাকুর বাবুরা এখানে জাহাজ এনেছেন, তখন কি আপনার ও-জাহাজে যাওয়া উচিত? 'তা বটে, যা বল্লে তার উত্তর নাই, চল ঐ জাহাজে যাওয়া যাক্।' এই বলে যাত্রীরা আমাদের জাহাজে অনেকে ফিরে আসেন। একটি বার বৎসর বয়স্ক বালক ঘাটে সেদিন বক্তৃতা দিয়াছিল। 'হে ভাই সকল, তোমরা আপনার জাহাজ থাকতে পরের জাহাজে যাইবা না। উহাদের ঐ যে জাহাজ দেখিতেছ, উহার যেরূপ গঠন তাহাতে একটু বেশী বাতাস উঠিলেই দোদুল্যমান হইয়া জলগর্ভে নিমগ্ন হইবে। তাহার সাক্ষী দেখ, উহারা এখানে জাহাজ রাখিতে পারে নাই—ওপারে লইয়া গিয়াছে এবং এই বাতাসেই দোদুল্যমান হইতেছে, যদি তোমরা প্রাণ বাঁচাইতে চাও ত ভাই সকল, ঐ জাহাজে যাইবা না—" এই কথা শুনে নীচশ্রেণী লোকদের ভয় হল আর প্রতিপক্ষের জাহাজে তারা গেল না। ঝড় হোক বৃষ্টি হোক রৌদ্র হোক—যে কোন বাধা হোক, কিছুই না মেনে তাঁরা জাহাজের সিটি (বাঁশির ডাক) শুনবামাত্র দৌড়ে ঘাটে এসে উপস্থিত হন। তাঁহারা বলেন আমাদের সিটি তাঁহাদের এমন মিষ্টি লাগে ও তা শুনতে পেলে তাঁহাদের এমন আমোদ হয় যে তাহা বলবার নয়। বন্ধুদের সুপরিচিত গলার স্বর দূর হতে শুনলে যেমন বুঝা যায় কে আসছে তেমনি সিটি শুনলেই কোন্ জাহাজ আসছে তাঁ'রা বুঝতে পারেন। ঐ আজ "ভারত" আসছে, ঐ "লর্ড রিপণ" আসছে, ঐ "বঙ্গলক্ষ্মী" আসছে, ঐ "স্বদেশী" আসছে—এই বলে সকলে উৎসাহের সহিত হাস্যমুখে দলবদ্ধ হয়ে ঘাটে এসে উপস্থিত হন। সেদিন একজন বলছিলেন, যেমন বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে হৃদয় আকৃষ্ট হত, সেইরূপ তাঁহাদেরও হৃদয় আকৃষ্ট হয়। আবার প্রতিপক্ষের জাহাজের নাম পর্য্যন্ত তাঁরা সইতে পারেন না—তার সিটিও তাঁদের কাণে অত্যন্ত কর্কশ লাগে। প্রতিপক্ষের জাহাজ যদি কোনদিন যাত্রী পায়—সেদিন তাঁদের আপসোসের আর সীমা থাকে না।

সেদিন আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য এখানে যে বৃহৎ সভা হয়েছিল, তাতে একটি বক্তা আমার ষ্টীমারের উল্লেখ করতে করতে হঠাৎ আপনাকে সম্বরণ করে বল্লেন—তাঁর ষ্টীমার ভুলক্রমে বলেছি—ইহা যে আমাদেরই ষ্টীমার—এই কথাটি আমার বড় ভাল লেগেছিল। সেদিন সে সভায় অনেক লোক একত্র হয়েছিলেন, একটি প্রকাণ্ড গৃহ লোকে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, এখানকার হাকিম, উকীল, জমিদার দোকানদার, মহাজন অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এখানকার প্রধান জমীদার শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেকগুলি সুবক্তা সেদিন বক্তৃতা করেছিলেন। সে দিন ছাত্রদিগের আহ্লাদ ও উৎসাহের সীমা ছিল না। তারা আপনারাই সভার বিজ্ঞাপন ঘরে ঘরে গিয়ে বণ্টন করেছিল, গাছের পাতা দিয়ে ঘরটি সুন্দর সাজিয়েছিল। তাদের উৎসাহ দেখলে নিরাশ প্রাণেও আশার সঞ্চার হয়—নিরুদ্যম হৃদয়ে উদ্যমের ভাব আসে।"

বলা বাহুল্য এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে উভয় পক্ষেই আর্থিক ক্ষতি অগ্রাহ্য করিয়া প্রতিপক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। ফ্লোটিলা কোম্পানী টিকিটের মূল্য হ্রাস করিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তদপেক্ষা মূল্য হ্রাস করিলেন। এইরূপ করিতে করিতে একরূপ বিনামূল্যেই যাত্রীগণকে লইয়া যাওয়া হইতে লাগিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সর্ব্বস্ব পণ করিয়া বিপক্ষকে উচ্ছেদ করিতে প্রয়াস পাইলেন। শুনিয়াছি সময়ে সময়ে যাত্রীগণের নিকট টিকিটের মূল্য লওয়া দূরে থাকুক, বিনামূল্যে তাহাদিগকে মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া স্বদেশী জাহাজে লওয়া হইত। স্বদেশী ষ্টীমার পরিচালনার এই প্রথম উদ্যম সফল করিবার জন্য, দেশের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য, স্বদেশপ্রাণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সর্ব্বস্ব ধরিয়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"প্রতিযোগিতার তাড়নায় জাহাজের পর জাহাজ তৈরি হইল, ক্ষতির পর ক্ষতি পড়িতে লাগিল এবং আয়ের অঙ্ক ক্রমশই ক্ষীণ হইতে হইতে টিকিটের মূল্যের উপসর্গটা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল, বরিশাল খুলনার ষ্টীমার লাইনে সত্যযুগ আবির্ভাবের উপক্রম হইল। যাত্রীরা যে কেবল বিনা ভাড়ায় যাতায়াত সুরু করিল তাহা নহে, তাহারা বিনামূল্যে মিষ্টান্ন খাইতে আরম্ভ করিল। ইহার উপরে বরিশালের ভলাণ্টিয়ারের দল স্বদেশী কীর্ত্তন গাহিয়া কোমর বাঁধিয়া যাত্রী সংগ্রহে লাগিয়া গেল। সুতরাং জাহাজে যাত্রীর অভাব হইল না, কিন্তু আর সকল প্রকার অভাবই বাড়িল বই কমিল না। অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে স্বদেশহিতৈষিতার উৎসাহ প্রবেশ করিবার পথ পায় না; কীর্ত্তন যতই জমুক, উত্তেজনা যতই বাড়ুক, গণিত আপনার নামতা ভুলিতে পারিল না। সুতরাং তিন তিরিক্ষে নয় ঠিক তালে তালে ফড়িঙের মত লাফ দিতে দিতে ঋণের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

"অব্যবসায়ী ভাবুক মানুষের একটা কুগ্রহ এই যে, লোকেরা তাঁহাদিগকে অতি সহজেই চিনিতে পারে,

কিন্তু তাঁহারা লোক চিনিতে পারেন না, অথচ তাঁহারা যে চেনেন না এইটুকু মাত্র শিখিতে তাঁহাদের বিস্তর খরচ এবং ততোধিক বিলম্ব হয় এবং সেই শিক্ষা কাজে লাগানো তাঁহাদের দ্বারা ইহজীবনেও ঘটে না। যাত্রীরা যখন বিনামূল্যে মিষ্টান্ন খাইতেছিল তখন জ্যোতিদাদার কর্ম্মচারীরা যে তপস্বীর মত উপবাস করিতেছিল এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় নাই; অতএব যাত্রীদের জন্যও জলযোগের ব্যবস্থা ছিল, কর্ম্মচারীরাও বঞ্চিত হয় নাই; কিন্তু সকলের চেয়ে মহত্তম লাভ রহিল জ্যোতিদাদার—সে তাঁহার এই সর্ব্বস্ব ক্ষতি স্বীকার।"

প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আরও কিছুদিন দেশের জন্য ষ্টীমার পরিচালনা করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, প্রতিপক্ষগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আর একটি য়ুরোপীয় কোম্পানীকে (হোরমিলার কোং) সমুদয় স্বত্ব বিক্রয় করেন। একটি য়ুরোপীয় কোম্পানীকে ফেল করিয়া অপর একটি কোম্পানীকে ফেল করিবার শক্তি না থাকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হতাশ হইয়া পড়িলেন। এই সময় একটি দুর্ঘটনা ঘটিল। তাঁহার "স্বদেশী" নামক জাহাজ খুলনা হইতে বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া নির্ব্বিঘ্নে সমস্ত পথ আসিয়া হাওড়ার পুলে ঠেকিয়া হঠাৎ জলমগ্ন হইল। জাহাজের বাণিজ্যদ্রব্যাদিও সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল। কেহ কেহ বলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কোনও কর্ম্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। এই দুর্ঘটনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ষ্টীমার পরিচালনা কার্য্য বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। বাবু (পরে রাজা) প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সময় প্রতিপক্ষগণের নিকট হইতে একটি প্রস্তাব আনিলেন যে তাঁহারা উপযুক্ত মূল্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমস্ত কারবার ক্রয় করিতে প্রস্তুত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অগত্যা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ পাইলেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার প্রভূত ঋণ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। এই সময়ে দানবীর পরোপকারী স্যর তারকনাথ পালিত তাঁহার বন্ধুর উপকারার্থে অগ্রসর হইলেন। তিনি উত্তমর্ণদিগকে বুঝাইয়া এবং স্বয়ং প্রভূত অর্থ সাহায্য করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে ঋণমুক্ত করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই জন্য তারকনাথের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ ছিলেন।

এইরূপে, রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাত হাজার টাকায় ক্রীত জাহাজের খোল ভর্ত্তি হইয়াছিল "কেবল এঞ্জিন ও কামরায় নহে, ঋণে এবং সর্ব্বনাশে। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে এই সকল চেষ্টায় ক্ষতি যাহা, সে একলা তিনিই স্বীকার করিয়াছেন, আর ইহার লাভ যাহা তাহা নিশ্চয়ই এখনো তাঁহার দেশের খাতায় জমা হইয়া আছে। পৃথিবীতে এইরূপ বেহিসাবী লোকেরাই দেশের কর্ম্মক্ষেত্রের উপর দিয়া বারম্বার নিস্ফল অধ্যবসায়ের বন্যা বহাইয়া দিতে থাকেন; সে বন্যা হঠাৎ চলিয়া যায়, কিন্তু তাহা স্তরে স্তরে যে পলি রাখিয়া চলে তাহাতেই দেশের মাটিকে প্রাণপূর্ণ করিয়া তোলে—তাহার পর ফসলের দিন যখন আসে তখন তাঁহাদের কথা কাহারও মনে থাকে না বটে, কিন্তু সমস্ত জীবন যাঁহারা ক্ষতি বহন করিয়াই আসিয়াছেন মৃত্যুর পরবর্ত্তী এই ক্ষতিটুকুও তাঁহারা অনায়াসে স্বীকার করিতে পারিবেন।"

আচার্য্য স্যর জগদীশচন্দ্র বসু একদিন আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন, "প্রবাল-কঙ্কাল হইতেই মহাদ্বীপের উৎপত্তি হইয়া থাকে।" আমরা বিশ্বাস করি, স্বদেশপ্রেমিক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বপ্ন অদূর ভবিষ্যতে সফল হইয়া স্বদেশের গৌরব বিঘোষিত করিবে।

"বালক"। যে সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ষ্টীমার পরিচালন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তিনি সে সময়ে সাহিত্য ও শিল্পচর্চ্চায় অনবহিত ছিলেন না। ঠিক এই সময়েই (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী মাননীয়া শ্রীযুক্তা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে সম্পাদিকা করিয়া রবীন্দ্রনাথ কিশোরবয়স্কগণের জন্য "বালক" নামক একখানি সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভবনে ১১ই মাঘ মাঘোৎসব হইয়া যাইবার পর তিনি ও পরিবারস্থ অপর কয়েকজন বালক পরদিন ভাঙ্গা আসরে "১২ই মাঘ" করিতেন। বালকবালিকারা মিলিয়া নানাপ্রকার আবৃত্তি, সঙ্গীত প্রভৃতি নির্দ্দোষ আমোদ করিতেন। এইরূপ এক ১২ই মাঘের সম্মিলনীতে ৺হিতেন্দ্রনাথ প্রমুখ তাঁহারা কয়েকজন স্থির করেন একটা বালক-বালিকা পরিচালিত মাসিকপত্র বাহির করিতে হইবে। বোধ হয় এই প্রস্তাব হইতেই রবীন্দ্রনাথের মনে 'বালক' প্রকাশের ইচ্ছা উদিত হইয়া থাকিবে। বালকে, পরিবারস্থ অন্যান্য লেখক-লেখিকাগণের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেন। তন্মধ্যে "মুখচেনা" নামক প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উহাতে বাঙ্গালার কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির প্রকৃতিসহ শিবসামুদ্রিকানুসারে তাঁহাদের চরিত্রসমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটি 'প্রবন্ধমঞ্জরীতে' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

এমিয়েলের জার্নাল।

(শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

শুদ্ধমাত্র একটি বস্তুরই প্রয়োজন—ঈশ্বরকেই প্রাপ্ত হওয়া। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল ঈশ্বরের সমীপবর্ত্তী হইবার পক্ষে বিভিন্ন দ্বারস্বরূপ। আমাদের বহির্জ্জগতের সহায়-সম্বলসমূহ, আমাদের অন্তর্জ্জগতের চিৎশক্তি-নিচয় ও হৃদ্‌বৃত্তিসমুদয়—আমাদের নিজস্ব যাহা কিছু, এ সমস্তই ঈশ্বরকে সম্ভোগের নিমিত্ত, ঈশ্বরকে বন্দনার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন পন্থারূপে বিদ্যমান। যাবতীয় ধ্বংসশীল পদার্থ হইতে প্রাণপণ চেষ্টায় মনকে নির্লিপ্ত রাখিয়া, বিশ্লিষ্ট রাখিয়া, যাহা পূর্ণ, যাহা অক্ষর, যাহা অবিনশ্বর, যাহা অশেষ তাহাতেই মনকে একান্তভাবে আসক্ত রাখা, সংযুক্ত রাখা, ইহাই আমাদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে শিক্ষা করিতে হইবে। জগতের, যাবতীয় বস্তুকে সম্ভোগ করিব সত্য বটে, কিন্তু তাহা অনন্তকালের বস্তুজ্ঞানে নহে—গচ্ছিত বস্তুরূপেই।......ঈশ্বরকে অর্চনা করা, তাঁহাকে জ্ঞাত হওয়া, প্রাপ্ত হওয়া, উপলব্ধি করা, সেই উপলব্ধিকে প্রচার করা, সেই উপলব্ধিতে কর্ম্ম করা—ইহাই আমার বিধি-ব্যবস্থা, আমার কর্ত্তব্য, আমার সন্তোষ, আমার স্বর্গ। যাহা সংঘটিত হইবার তাহা সংঘটিত হউক—এমন কি, যদি মৃত্যু ঘটে ঘটুক। কেবল তাঁহার সহিত শান্তিতে সম্মিলিত হও, ঈশ্বরসান্নিধ্যে ঈশ্বরসহযোগে কালযাপন কর। তোমার পার্থিব জীবন নৈসর্গিক শক্তিনিচয়ের করতলগত, এবং তাহাদের বিরুদ্ধে যাইবার ক্ষমতাও তোমার নাই, সুতরাং তদ্বিষয়ে তাহাদেরই হস্তে আত্মসমর্পণ কর। যদি মৃত্যু আমাকে সময় দান করে—উত্তম। যদি মৃত্যুর আহ্বান নিকটবর্ত্তী হয়—অধিকতর উত্তম। পার্থিবোন্নতির ব্যর্থতা প্রযুক্ত অর্দ্ধ-মৃত্যুই যদি আক্রমণ করে তাহাও যে পরম শুভই—কারণ শৌর্য্যের, নৈতিক বীর্য্যের, আত্মোৎসর্গের ত্রিবিধ মার্গ আমার সম্মুখে যেন প্রসারিত দেখিতে পাই, তন্নিমিত্তই পার্থিবোন্নতির পন্থা আমার নিকট অবরুদ্ধ রহিল। প্রত্যেক জীবনেই মহত্ত্বের বীজ নিহিত আছে এবং যেহেতু ব্রহ্মকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মসত্তার বাহিরে বিহার করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, সেইজন্য সজ্ঞানে ব্রহ্মেতে অবস্থান করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত কার্য্য।

বার্লিন

১৬ই জুলাই, ১৮৪৮।

তোমার সান্নিধ্যে এইমাত্র যে এক ঘণ্টা কালক্ষেপণ করিলাম, সেজন্য হে আমার প্রভু, তোমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তোমার অভিপ্রায় আমার সম্মুখে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইল। আমার প্রভূত পাপরাশির গুরুত্ব নিরূপণ করিয়া, আমার দুঃখবেদনা গণনা করিয়া, আমার প্রতি তোমার প্রগাঢ় প্রেম অনুভব করিলাম। আমার ক্ষুদ্রতা—আমার শূন্যতা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে হৃদয়ঙ্গম করিলাম। তুমি তোমার অগাধ শান্তি আমাকে প্রদান করিলে। সংশয়াতীতরূপে বুঝিলাম তিক্ততার মধ্যে মিষ্টতা, দুঃখ-পীড়নের মধ্যে হর্ষোল্লাস, বশ্যতার মধ্যে শক্তি। যে পিতা আমাদিগকে দণ্ডবিধান করেন, সেই পিতাই আমাদিগকে প্রেম প্রদান করেন। জীবনের উৎসর্গে নবজীবন প্রাপ্তি, সর্ব্বত্যাগে সর্ব্বজয়ী, সম্পূর্ণ রিক্ততায় পরমাত্মাকে লাভ—ইহা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে মহান সত্য বিরাজিত। যে ব্যক্তি দুঃখ-আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই, সে আনন্দের প্রকৃত আস্বাদন লাভ করে নাই। ত্রাণের নিমিত্ত ঈশ্বর-মনোনীত আত্মাগণ অপেক্ষা অনুতাপানলে পূত আত্মারাই অধিকতর সুখী।

জিনেভা

২৭শে অক্টোবর, ১৮৫৩।

মঙ্গলের বলে অমঙ্গলের যে রূপান্তর ঘটে ইহাই অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক ব্যাপার। স্বাধীন মানবগণকে ভগবানের মধ্যে পৌঁছাইয়া উদ্ধার করা, পাপ-ভারাক্রান্ত জগতকে পুণ্য-রাজ্যে নীত করা, ইহাতেই সৃষ্টির সার্থকতা, ইহা দ্বারাই অনন্ত করুণাময়ের শাশ্বত ইচ্ছাশক্তির সফলতা। ধর্ম্মালোক স্পর্শে আমূল পরিবর্ত্তিত প্রত্যেক আত্মাই নিখিল জগতের উদ্ধার ও পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে এক একটি সাক্ষীস্বরূপ। সুখী হওয়া, অনন্ত জীবন লাভ করা, ঈশ্বরেতে অবস্থিতি, ত্রাণ পাওয়া—এ সমস্তই অভিন্ন, এ সমস্ত একই, এবং ইহাদের প্রত্যেকটিরই অর্থ—জীবন-রহস্যের সমাধান। ক্লেশের ন্যায় আনন্দও নিবিড় হইতে নিবিড়তর হয়। শাশ্বত শান্তি উত্তরোত্তর ঘনীভূত স্বর্গীয় উল্লাস,—একমাত্র ইহাই চিরবর্দ্ধনশীল, ইহাই একমাত্র ভূমানন্দ; সীমাবিবর্জ্জিত, যেহেতু বিশ্বপতি সীমাশূন্য এবং অদ্বিতীয়। প্রেমের দ্বারা জগৎপতিকে জয় করিয়া নিজস্ব করা ভিন্ন আনন্দের অন্য কোন অর্থই নাই।

জীবনের মূল মস্তিষ্কের চিন্তায় নহে, অন্তরের ভাবে নহে, চিত্তের ইচ্ছাশক্তিতে নহে—এমন কি, যে চৈতন্য চিন্তা করে, অনুভব করে, ইচ্ছা করে, সেই চৈতন্যতেও নহে; কারণ সত্য এই সকল উপায়ে লাভ করা সম্ভব হইলেও, সে লাভ চিরস্থায়ী না হইতেও পারে। চৈতন্যের স্থিতিস্থান হইতেও গভীরতর প্রদেশে আমিত্বের অস্তিত্বভূমি। সেই প্রদেশেই মানবপ্রকৃতির সারাংশের বাস। এই সর্ব্বশেষ দূরতম ক্ষেত্রে যে সকল সত্যের

প্রবেশাধিকার, তাহাই আমাদিগের আপনার এবং সেই সমস্ত সত্যই নিঃসংশয়রূপে আমাদিগের জীবন—তাহারাই আমাদিগের সম্পত্তি অপেক্ষা অধিক। সেই সত্য সকল সহজ ও গতিশীল, স্বতঃপ্রবৃত্ত ও আমাদের জ্ঞানাতীত। সত্য এবং আমাদিগের মধ্যে যতদিন পর্য্যন্ত আমরা ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া চলি, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা প্রকৃত সত্য-জীবনের বহির্ভাগেই বিচরণ করি। আমাদের চিন্তা, ভাব, বাসনা, অহমিকার জ্ঞান—এই সকল আমাদের যথার্থ জীবন নহে। বিশ্রাম ও শান্তি অনন্ত জীবন ভিন্ন কুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না; অনন্ত জীবনই পারমার্থিক জীবন এবং সেই জীবনই পরম ব্রহ্ম। মানবজীবনের সত্যই ব্রহ্মজীবনে পরিণত হওয়া। সত্যকে তখনই কেবল আমাদের নিজেদের বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি, তখনই সত্য কেবল অবিনশ্বর হয়; কারণ সত্য তখন আমাদের বাহিরের কোনো স্বতন্ত্র বস্তু নহে, আমাদের অন্তরের এইরূপও নহে, কিন্তু আমরাই সত্য এবং সত্যই আমরা। আমরা নিজেরাই একটি সত্য, একটি ইচ্ছা, ব্রহ্মের একটি কর্ম্মফল। স্বাধীনতা তখন আমাদের প্রকৃতির মজ্জাগত। সৃষ্ট জীব স্রষ্টারই সঙ্গে একাত্ম হইয়া অবস্থিত—প্রেমসূত্রে বদ্ধ হইয়া তাহারা অভিন্ন। এই মিলন ব্যতীত জীবাত্মার গত্যন্তর নাই, এই মিলনেই ইহার শিক্ষা সম্পূর্ণ, এই মিলনেই ইহার শেষ অক্ষয় আনন্দ আরম্ভ, এই মিলনেই সীমাবদ্ধ পার্থিব কাল-সূর্য্যের তিরোধান এবং চিরন্তন আনন্দ-সূর্য্যের আবির্ভাব।

নগণ্য দূর্ব্বারও এমন কোন একটিও দল নাই, যে দল রহস্যের কোন কাহিনী বর্ণনা না করে; এমন একটিও হৃদয় নাই, যে হৃদয় আপনার মধ্যে কোন অলৌকিক উপন্যাস সৃজন না করে; এমন কোনই জীবন নাই, যে জীবন তাহার নিভৃত মর্ম্মস্থলে কোন রহস্যের কণ্টক নীরবে বহন না করে। সর্ব্বস্থানেই দুঃখ-বেদনা, সর্ব্বস্থানেই আশা-ভরসা, সর্ব্বস্থানেই মিলনাত্মক ও সর্ব্বস্থানেই বিয়োগাত্মক নাটক। পাষাণকারী শক্তির ফলে সুদূর অতীত যুগের পাষাণীভূত জীবের বিজড়িত সঙ্কুচিত দেহমধ্যে যৌবনের যে মহা পীড়ন ও আলোড়ন-বিলোড়ন লক্ষিত হয়, সেই লক্ষ্য-প্রসূত চিন্তাই কবিকুল ও ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিগণের নিকট ঐন্দ্রজালিকের মোহন দণ্ডস্বরূপ। সেই চিন্তাই পার্থিব স্থূল চক্ষুর কঠিন মোহাবরণগুলিকে ছিন্ন করিয়া মানবজীবনকে স্পষ্টরূপে নিরীক্ষণ করিবার পক্ষে আমাদিগকে দৃষ্টি দান করে। সেই চিন্তাই কর্ণকুহরে অশ্রুতপূর্ব্ব সুমিষ্ট অজস্র সুর-সম্মিলিত সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া তোলে এবং প্রকৃতির অনন্ত ভাষা তখনই আমাদিগের নিকট অর্থময় হইয়া উঠে। ব্যর্থপ্রেম মানবকে প্রকৃতির অনন্ত জ্ঞানে বিভূষিত করে এবং দুঃখবেদনা মানবকে ত্রিকালদর্শী ঋষির পদে প্রতিষ্ঠিত করে।

ঐ দেশে ঐ দিবসে ভিন্ন সময়ে।

শ্রীমতী গার্গী দেবীর বিলাতগমনে ব্রহ্মোপাসনা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বেদগান।

ওঁপিতা নোঽসি। পিতা নো বোধি
নমস্তেঽস্তু। মা মা হিংসীঃ।
বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।
নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ
নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ ॥
ওঁ পিতা তুমি। জ্ঞানদাতা হে।
নমি তোমা। ছেড়োনাকো মোরে।
সমগ্র দেব হে পিতা, ত্বরিত মোর করি' দূর।
আশীষ তব বরিষ।
নমি দেব শম্ভব শুভদাতা হে
নমি দেব শঙ্কর শুভাকর হে
নমি দেব শিব শিবতর তোমায় হে ॥

ঈশ্বরপ্রীতিকাম হইয়া তাঁহার উপাসনায় এসো আমরা সকলে প্রবৃত্ত হই।

উদ্বোধন।

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং ॥

চক্ষু যেমন আকাশে বিস্তৃত পদার্থসকল দর্শন করে, সেইরূপ শ্রদ্ধাবান ধীরেরা সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার পরম পদ সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া থাকেন।

সেই পরমদেবতা সম্মুখের এই অনন্ত আকাশে জাজ্বল্যমান প্রকাশ পাইতেছেন। অখিল ব্রহ্মাণ্ড সেই মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতা ভগবানকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। তিনি আমাদের প্রত্যেকের আত্মাতেও অন্তর্যামীরূপে স্বপ্রকাশমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছেন। সেই আত্মার আত্মাকে, সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরকে আত্মাতে প্রত্যক্ষ করিয়া এসো ভক্তিভরে তাঁহারই চরণে কোটী কোটী প্রণিপাত করি।

প্রণাম।

ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন; যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে; সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি।

সমাধান।

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। শান্তং শিবমদ্বৈতং। শুদ্ধমপাপবিদ্ধং।

যে সিদ্ধিদাতা বিধাতাপুরুষ আমাদের পূজাগ্রহণের নিমিত্ত এখনই এখানে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্ম। তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয়। তিনি শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। অনন্যমনা হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক স্বীয় আত্মাকে শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ সেই অদ্বিতীয় মঙ্গলস্বরূপে সমাধান করি।

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥
ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

ইহা হইতে প্রাণ, মন ও সমুদয় ইন্দ্রিয়, এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ইঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে; ইঁহার ভয়ে মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চলিত হইতেছে এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

স্তোত্র।

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়।
নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়॥
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়।
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং।
ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশং॥
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্ত্তৃ।
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্বিকল্পং॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং।
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং॥
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকম্।
পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাং॥
বয়ন্ত্বাং স্মরামো বয়ন্ত্বাং ভজামো।
বয়ন্ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ॥
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং।
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥

তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ, এবং জ্ঞানস্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার। তুমি মুক্তিদাতা, অদ্বিতীয়, নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমিই সকলের আশ্রয়স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়; তুমিই এক এই জগতের পালক ও স্বপ্রকাশ। তুমিই জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা; তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল ও বিধাশূন্য। তুমি সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক; তুমি প্রাণীগণের গতি ও পাবনের পাবন। তুমিই মহোচ্চ পদসকলের নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষকদিগেরও রক্ষক। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি। তুমি জগতের সাক্ষী, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। সত্যস্বরূপ, আশ্রয়স্বরূপ, অবলম্বরহিত, সংসারসাগরের তরণী অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই।

গান।

কুকভ—তেওট।

তাঁহারি শরণ লয়ে রহিও—শরণ লয়ে রহিও।
যাঁহারি কৃপায় তুমি খুলিলে নয়ন—তাঁরে আগে দেখিও॥

উপদেশ।

প্রাণাধিকা গার্গী! বিলাতযাত্রার মুখে আমি তোমাকে দুই-চারিটী কথা বলিতে চাই—তুমি সেগুলি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর এবং সযত্নে অন্তরে ধারণ করিও। আনন্দময়কেও যেমন বলিয়াছিলাম, তেমনই তোমাকেও বলিতেছি—আমি তোমাকে যাহা কিছু বলিব, তাহার সর্ব্বপ্রথম কথা এই যে, ঈশ্বরকে ভুলিও না; তাহার মধ্য কথা এই যে, ঈশ্বরকে ভুলিও না; তাহার সর্ব্বশেষ কথা এই যে, ঈশ্বরকে ভুলিও না। সম্পদে, বিপদে সুখে দুঃখে তাঁহাকে সকল সময়ে, সকল স্থানে ও সকল অবস্থায় স্বপ্রকাশ দেখিবে—তাহা হইলেই বিপদজাল কাটিয়া যাইবে এবং দুঃখশোক হইতে মুক্তিলাভ করিবে; সুখ-সম্পদ তোমার হস্তগত হইবে এবং মঙ্গল ও উন্নতি তোমার পার্শ্বচর হইবে।

তুমি তোমার স্বামীর মঙ্গল কামনা করিয়া সমস্ত ভাবনা অতিক্রম করিয়া বিদেশযাত্রায় উদ্যত হইয়াছ। এতদিন তুমি আমাদের নিকটে থাকিয়া নিত্য আনন্দবর্দ্ধন করিতেছিলে; কিন্তু এখন তোমাকে তোমাদের মঙ্গলকামনা করিয়া আমরাও আনন্দিতমনে বিদেশযাত্রায় অনুমতি দিতেছি। এতদিন তোমার মনে কোন প্রশ্ন উঠিলে তুমি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে; আবার আমাদের মনে কোন প্রশ্ন উঠিলে আমরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতাম। এই প্রকারে আমরা পরস্পর পরস্পরের উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার সহায়তা করিতাম। এখন অবধি তোমার পক্ষে আমাদের অভিজ্ঞতার আশ্রয় লাভ করিবার বেশী সুবিধা হইবে না; এখন অবধি তোমাকে নিজের উপরেই নির্ভর

করিয়া চলিতে হইবে; প্রতি পদে সংসারের পথে ধীর-ভাবে বিবেচনা করিয়া চলিতে হইবে।

নিজের বুদ্ধিবিবেচনার উপর নির্ভর করিতে হইবে বলিয়া ভয় পাইও না। ইহা নিশ্চিত জানিও যে তোমার অন্তরে অকিঞ্চনগুরু সর্ব্বদাই জাগ্রত আছেন। কোন বিষয়ে তোমার যদি কোন সংশয় উপস্থিত হয়, তবে, সন্তান যেমন সংশয়ে পড়িলে নির্ভয়ে পিতামাতার নিকটে মীমাংসার জন্য ছুটিয়া যায়, তুমিও সেইরূপ নির্ভয়ে সেই সদা জাগ্রত অকিঞ্চনগুরুকে পথ দেখাইবার জন্য আহ্বান করিবে; তুমি অবাক হইয়া দেখিবে যে, তিনি তোমার সংশয় বিদূরিত করিয়া দেবেন এবং তুমি কোন্ পথে চলিলে তোমার মঙ্গল হইবে, তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে দেখাইয়া দেবেন। ছোট বড় যে কোন প্রশ্ন তোমার মনে উপস্থিত হইবে, আমার অভিজ্ঞতালব্ধ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর—প্রত্যেক প্রশ্ন জননীর নিকটে কন্যার ন্যায় তাঁহার চরণে নিবেদন করিবে—এবং তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিয়া যদি তুমি প্রত্যেক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে অমঙ্গল তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তিনি সকল গুরুর গুরু; তিনিই এক-মাত্র অভ্রান্ত গুরু। জগতে এমন কেহই নাই, যিনি তাঁহার মত তোমাকে সদুপদেশ দিতে পারিবেন। তোমাকে আমি সর্ব্বপ্রথম এই মন্ত্র দিতেছি—তুমি দিনে নিশীথে তাঁহাকে অন্তরে সর্ব্বদাই অকিঞ্চনগুরুরূপে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিবে।

ভগবান কেবল অকিঞ্চনগুরু নন, তিনি আমাদের প্রত্যেকের অন্তর্যামী ভগবান—তিনি আমাদের প্রত্যে-কের অন্তরে থাকিয়া আমাদিগকে মঙ্গল ও উন্নতির সঙ্গে সুখসম্পদলাভেরও পথে পরিচালিত করিতেছেন। তিনিই সকল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধীশ্বর। সুখসম্পদ লাভের জন্য খুবই চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাহা লাভ করিলে তাহার অপব্যবহার করিবে না। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ এই যে, ধর্ম্মে অর্থে, জ্ঞানে মানে সর্ব্ববিধ ভাল বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার করিবার সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিবে। ভগবানের আদেশ ও নির্দ্দেশ অনুসারে যদি চলিতে থাক, তবে দেখিবে, সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার করা বিশেষ কঠিন হইবে না। তুমি কেবল নিজে এইভাবে অগ্রসর হইয়া ক্ষান্ত থাকিবে না; তোমার স্বামী ও পুত্রকন্যাদিগকেও এই ভাবে শিক্ষা দিবে ও উৎসাহিত করিবে; দেখিবে, তোমার গৃহ অচিরে কিরূপ উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করে।

ভগবানকে সমুদয় হৃদয় দিয়া প্রীতি করিবে এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে সর্ব্বদাই আপনাকে নিরত রাখিবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের এই বীজমন্ত্রকে তুমি তোমার প্রাণেরও বীজমন্ত্ররূপে ধারণ করিয়া রাখিবে। ভগবানের সঙ্গে যোগসাধনের ইহাই একমাত্র উপায়। তাঁহাকে অন্তরের সঙ্গে প্রীতি করিতে থাকিলে স্পষ্ট অনুভব করিবে যে, তিনি কেবল এই বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে নাই, কিন্তু তিনি তাঁহার স্নেহপ্রেমে তোমাকে অন্তরে বাহিরে বর্ম্মদুর্গরূপে ঘিরিয়া আছেন। বিদেশে যাইতেছ—তোমার প্রতি আমার বিশেষ উপদেশ এই যে, প্রতিদিন সমস্ত কার্য্যের আরম্ভে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ভগবানের উপাসনা করিতে, তাঁহার সঙ্গে আত্মার যোগসাধন করিতে কখনও ভুলিও না। কোনও সূত্রে সংশয়বাদকে অন্তরে স্থান দিয়া নিজের বিনাশ নিজে ডাকিয়া আনিও না। তাঁহার সঙ্গে নিয়মিত যোগ-সাধন করিলে সকল কর্ম্মে আশ্চর্য্য তেজ ও শক্তি অনুভব করিবে। তখন তুমি বুঝিতে পারিবে যে, এই সমগ্র বিশ্বজগতের যিনি স্রষ্টা ও বিধাতা, তিনিই তোমারও সত্যই পিতামাতা এবং সখা ও সুহৃৎ। তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলে, তিনি যেমন এখানে তোমাকে কত গুরুতর বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তেমনই তিনি তোমাকে মহাসাগরবক্ষে এবং সেই সুদূর প্রবাসভূমিতেও রক্ষা করিবেন। প্রাণাধিক আনন্দ-ময়কে যেমন তিনি মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরাইয়া আনি-য়াছেন, সেইরূপ তোমাকেও তিনি সকল বিপদ আপদ হইতে মুক্ত করিয়া দেশে স্বামীর সঙ্গে তোমাকে গৌরবান্বিত করিয়া সুস্থশরীরে ও সুস্থমনে ফিরাইয়া আনিবেন।

সে দিন আমি তোমাকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা প্রদান করিয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্মের অমিয়ময় দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আর পশ্চাতে পড়িয়া থাকিও না—উন্নতির পথে ও মঙ্গলের পথে স্বামী ও সন্তানগণের সহিত ক্রমাগতই দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে থাকিবে। ভুলভ্রান্তি হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়—কিন্তু তাহার জন্য কিছুমাত্র ভীত হইও না; সম-স্তই ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়া দিবে—পদ্মপত্রে যেমন জল দাঁড়াইতে পারে না, সেইরূপ ভগবানের চরণে নিবেদিত মনেও ভুলভ্রান্তি দাঁড়াইতেও পারে না, বা তাহার কোন দাগও অঙ্কিত হইতে পারে না। তুমি যেখানে যাইতেছ, সেখানে শতবিধ প্রলোভন বিপথে লইয়া যাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে। তোমরা পরস্পর পরস্পরকে সেই সকল প্রলোভনের অতীত থাকিবার জন্য সাহায্য করিবে। নানা ঘাতপ্রতিঘাতে সেখানে তোমাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে, ভগবানের চরণ হইতে দূরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিবে। সাবধান, সাব-ধান, সাবধান—তাঁহা হইতে আপনাকে কদাপি বিচ্ছিন্ন করিও না। তাঁহার প্রতি সংশয় আসিলেই জানিবে

যে, আত্মা রোগে পড়িয়াছে; তখনই চিকিৎসক সেই ভগবানকে ব্যাকুলপ্রাণে ডাকিবে—তিনিই তোমার আত্মাকে রোগমুক্ত করিবেন। তাঁহার ন্যায় আত্মা ও মনের চিকিৎসক কোথাও পাইবে না।

সর্ব্বশেষে তোমার প্রতি আমার উপদেশ এই যে, বিলাতের চাকচিক্যে নিজের জন্মভূমিকে ভুলিও না। যে ধর্ম্মে তুমি পরিপুষ্ট হইয়াছ, যাহার সংযত স্বাধীনতা তোমাকে ঈশ্বরের পথে এতদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছে, সেই ধর্ম্ম ভারতেরই ধর্ম্ম। ধর্ম্মই দেহ, মন ও আত্মা সর্ব্ববিষয়ক উন্নতির মূল। জন্মভূমি দরিদ্র হইলেও তাহার শাকভাতে তোমার শরীর মন ও আত্মাকে যথাসাধ্য গড়িয়া তুলিয়া তোমাকে সেই ধর্ম্মবলের অধিকারী করিয়াছে; পিতামাতার ভাইভগ্নীর অকৃত্রিম স্নেহযত্নে লালিত-পালিত হইয়া আজ তুমি ভগবানের সঙ্গে যোগসাধনের পথে অগ্রসর হইয়াছ—মনুষ্য হইয়া সেই জন্মভূমিকে, পিতামাতা ভাই-ভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনকে ভুলিয়া যাইও না। দেশের ভাবের সঙ্গে প্রাণের যোগ রাখিলেই পরিণামে জয়যুক্ত হইবে। এই সত্যটী তোমরা উভয়েই প্রাণের ভিতর গাঁথিয়া রাখিবে। এই-ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মকে জীবনে পরিণত করিলেই সকল বিষয়ে, কি জ্ঞানে, কি বিদ্যায়, কি ধর্ম্মে, কি অর্থে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান সহজেই অধিকার করিতে পারিবে। জন্মভূমি এবং তোমার পিতামাতা দরিদ্র বলিয়া আপনাকে ধিক্কার দিও না।

আনন্দময়কে যে আশীর্ব্বাদ দিয়াছিলাম, তুমিও আমার সেই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর—তুমি কখনই ভগবানকে পরিত্যাগ করিও না, ভগবান কর্ত্তৃক তুমি সর্ব্বদাই অপরিত্যক্ত থাক। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি তোমার স্বামীর প্রেমের অনন্যপাত্র হও এবং তাঁহার জ্ঞানে, কর্ম্মে ও ধর্ম্মে বড় হইবার পথে সহায় হও। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা উভয়ে দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া ভগবানে শ্রদ্ধাবান থাক, তোমাদের গৃহ ধনে পুত্রে পরিপূর্ণ হোক; তোমাদের পরিবার দানশীল হইয়া দেশের কল্যাণসাধনে নিরত হউক।

হে পরমাত্মন্! তোমারই আদেশে আমার প্রাণাধিকা কন্যা শ্রীমতী গার্গী তাহার স্বামীর কল্যাণউদ্দেশ্যে বিলাত যাত্রা করিতেছে। তোমার নিকট ব্যাকুল অন্তরে এই প্রার্থনা করিতেছি—এখানে তুমি যেমন আমাকে যত্ন করিয়া ইহাকে সকল প্রকার বিপদ আপদ হইতে, এমন কি মৃত্যুর মুখ হইতেও বাঁচাইয়াছ, সেইরূপ সেই সুদূর প্রবাসে এবং সমুদ্রবক্ষে ইহাকে নিজের ক্রোড়ে রাখিয়া সকল প্রকার বিপদ আপদ হইতে দূরে রাখিও। এই যাত্রার পরিণামে তোমার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হোক; আনন্দময়ের কল্যাণ হোক; দেশের মঙ্গল হোক; পরিবারের গৌরববৃদ্ধি হোক এবং ইহাদের গৃহসংসার তোমার মঙ্গল কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক এবং সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীসম্পন্ন হোক।

ওঁ য একোঽবর্ণোবহুধাশক্তিযোগাৎ
বর্ণাননেকান্নিহিতার্থোদধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ সদেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

যিনি এক এবং বর্ণহীন; এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহুপ্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্তমধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর, তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।

সাংখ্যে ঈশ্বরবাদ।

(অধ্যাপক ৺অভয়কুমার মজুমদার এম-এ লিখিত ইংরাজী নিবন্ধের শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার এম-এ, পি. এইচ-ডি কৃত অনুবাদ)

ঈশ্বরাস্তিত্বের সাক্ষাৎপ্রমাণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এক্ষণে দেখা যাউক, সাংখ্যদর্শনসম্বন্ধে সমধিক প্রামাণিক গ্রন্থ 'সাংখ্যকারিকা'তে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট প্রমাণ আছে কি না। আমার মতে আছে। দশম ও একাদশ শ্লোকে ইহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, জগতে যেরূপ কেবল এক পরমা প্রকৃতি আছে, সেইরূপ কেবল এক পরম পুরুষও আছেন। সেই শ্লোক দুইটী এই—"হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্। সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং, বিপরীতমব্যক্তম্"। ১০॥ "ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি। ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্" ॥ ১১ ॥ অর্থাৎ, "ব্যক্ত—হেতুবিশিষ্ট, অনিত্য, অব্যাপী, সক্রিয়, অনেক, আশ্রিত, বিশেষণযুক্ত, সাবয়ব ও পরতন্ত্র; অব্যক্ত—ইহার বিপরীত"। ১০। "ব্যক্ত—ত্রিগুণ, অবিবেকী, বিষয়াতীত, সামান্য, অচেতন ও প্রসবধর্ম্মী; প্রকৃতি বা প্রধানও এইরূপই; পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের ন্যায় পুরুষ এই সকল বিষয়েও ইহার বিপরীত"। ১১। এখানে শেষোক্ত বাক্যটী—'তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্", অর্থাৎ "পুরুষ বা আত্মা পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের ন্যায় এই সকল বিষয়েও ইহার বিপরীত"—লক্ষ্য করিতে হইবে। ইহার অর্থ এই যে, পুরুষ বা আত্মা যেরূপ গুণবিশিষ্ট তাহা ব্যক্তের গুণের বিপরীত; সুতরাং এইরূপে পরিগণনা করা যায়—পুরুষ অজ, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, অপরিবর্ত্তনীয়, অদ্বিতীয়,

অনাশ্রিত (নিরবলম্ব), অবিচ্ছেদ্য, নিরবয়ব, স্বতন্ত্র, ত্রিগুণাতীত, বিবেকী, অবিষয় বা আধ্যাত্মিক, বিশিষ্ট বা অসামান্য, চেতন ও অপ্রসবধর্ম্মী। উপরি-উক্ত তালিকায় পুরুষের একটী গুণ আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে, সে গুণটী—'এক বা অদ্বিতীয়'। এখানে পুরুষ বা আত্মাকে এক অদ্বিতীয় বলা হইয়াছে; এই এক বা অদ্বিতীয় শব্দটী অতিশয় অর্থপূর্ণ এবং ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদের কারণ হইয়াছে। সুতরাং আত্মা বা পুরুষ এক অথবা বহু এই সমস্যার মীমাংসা সম্পূর্ণরূপে এই শব্দটীর যথার্থ অর্থের উপর নির্ভর করিতেছে। গৌড়পাদ বলেন—"অনেকং ব্যক্তমেকমব্যক্তং তথা চ পুমানপ্যেকঃ", অর্থাৎ "ব্যক্ত বহু, অব্যক্ত এক, সেইরূপ পুরুষও এক"। বাচস্পতি মিশ্র ভিন্ন অর্থ করিতেছেন—"স্যাদেতৎ অহেতুমত্ত্ব-নিত্যত্বাদি-প্রধানসাধর্ম্ম্যমস্তি পুরুষস্য, এবমনেকত্বং ব্যক্ত-সাধর্ম্ম্যং। তৎ কথমুচ্যতে তদ্বিপরীতঃ পুমানিত্যত্র আহ তথাচেতি চকারঃ—অপ্যর্থঃ"। অর্থাৎ "পুরুষ প্রকৃতির ন্যায় অজ, নিত্য প্রভৃতি হউন্; তিনি ব্যক্তের ন্যায় বহুও বটে; যদি তাহাই হয়, তবে কিরূপে বলা হয় যে পুরুষ ব্যক্তের বিপরীতধর্ম্মী, এই জন্য বলা হইয়াছে যে পুরুষ ব্যক্তেরও ন্যায় বটে। এখানে 'চ'র অর্থ 'অপি' অর্থাৎ 'ও'।" বাচস্পতি বলেন যে তাঁহার এই ব্যাখ্যা যাহাতে পুরুষের বহুত্ব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে সেই ১৮শ সূত্র হইতে আসিতেছে। সাংখ্যচন্দ্রিকা এই ব্যাখ্যার সমর্থন করিয়াছেন। অধ্যাপক উইল্‌সন্ বাচস্পতির সহিত একমত হইয়া বলিয়াছেন—"আত্মার গুণগুলি যে প্রকৃতিজাত দ্রব্যের গুণগুলির বিপরীত—এই সাধারণ মতের কেবল একস্থানে একটু পরিবর্ত্তন আবশ্যক। ব্যক্ত (discrete principle) বহু, অনেক বলিয়া অভিহিত; সুতরাং আত্মার অদ্বিতীয় বা এক হওয়া উচিত, এবং সাংখ্য-ভাষা অনুসারেও ইহা তাহাই বটে। অপরপক্ষে আত্মার বহুসংখ্যকত্বহেতু সাংখ্য-তত্ত্বকৌমুদী আত্মাকে ব্যক্তের সহিত এক করিয়াছেন। … … সাংখ্য-চন্দ্রিকা এই ব্যাখ্যা সমর্থন করিয়াছেন—" 'তথা চ'" এই শব্দদ্বয়ের দ্বারা এই বুঝায় যে আত্মা অনেকসংখ্যাহেতু ব্যক্তের অনুরূপ।" বস্তুতঃ ইহাই সাংখ্যের মত, কারণ পরে ১৮ সূত্রে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং কপিলসূত্রেরও অনুবর্ত্তী; 'অবস্থাভেদে বহুপুরুষত্ব সিদ্ধ হইয়াছে,' অর্থাৎ 'সাধুপুরুষেরা পুনরায় স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন, দুরাত্মারা নরকে পুনর্জন্ম লাভ করে; নির্ব্বোধেরা ভ্রমেতে ঘুরিয়া বেড়ায়, এবং জ্ঞানীরা মুক্তিলাভ করে'। সুতরাং, হয় গৌড়পাদ ভুল করিয়াছেন, অথবা তাঁহার 'এক'-শব্দে বুঝিতে হইবে যে সাধারণ হিসাবে আত্মা এক নহে, পরন্তু জন্মজন্মান্তরে বা উৎক্রমণে ইহা এক বা বহু; অথবা কোলব্রুক সাহেব যেরূপ বলিয়াছেন (রয়েল এসিয়াটিক্ সোসায়িটী-অনুবাদ ১ম খণ্ড পৃঃ—৩১) 'অবিভক্ত'। সূত্রগুলিতেও এই জন্য বলা হইয়াছে যে 'আকাশ যেরূপ বহু পাত্রে সম্বদ্ধ হইতে পারে, সেইরূপ এক আত্মারও পাত্র বা আধারভেদে বহুভাবে মিলন সম্ভব।' সুতরাং আত্মার এই একত্ব সেই বিশেষ আত্মাতেই প্রযোজ্য, যাহা বহু জন্মজন্মান্তর, মৃত্যু, বন্ধন ও মোক্ষ প্রভৃতির অধীন; কারণ ভাষ্যকার বলিতেছেন—'এক পুরুষই পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, অপর পুরুষ নহে। সুতরাং গৌড়পাদ যে আত্মার একত্বের কথা বলিতেছেন তাহা নিশ্চয়ই এই অর্থেই বুঝিতে হইবে।'

বাচস্পতির উক্ত ব্যাখ্যা কষ্টকল্পিত এবং ১০ম ও ১১শ কারিকার ভাবের সহিত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যদি 'তথা চ'র অর্থ বাস্তবিকই 'ব্যক্তের ন্যায়' হয়, তাহা হইলে ইহা বুঝা কঠিন যে এই সাদৃশ্য ১০ম সূত্রে যে সকল গুণ বলা হইয়াছে তাহাদের পক্ষে প্রযুক্ত না হইয়া একটীমাত্র গুণের (অনেকত্ব) পক্ষেই কেবল খাটিবে কেন? যদি বহু বলিয়া পুরুষ ব্যক্তের সদৃশ হয়, তাহা হইলে পুরুষ কেন জন্মবিশিষ্ট, অনিত্য, পরিচ্ছিন্ন প্রভৃতি গুণবিষয়েও প্রকৃতির সদৃশ হইবেন না? বাচস্পতি এই বিশেষত্বের কোনও কৈফিয়ৎ দেন না। কিন্তু তথাপি অপরে আপত্তি করিতে পারে যে জন্ম প্রভৃতি গুণগুলি পুরুষের পক্ষে প্রযোজ্য নহে; পুরুষ জাত প্রভৃতি ধারণার বহির্ভূত, কারণ পুরুষ যদি জন্মাদিবিশিষ্ট হয়েন, তাহা হইলে তিনি ব্যক্তের শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়েন; কিন্তু ইহা ৩য় সূত্রের সহিত অসঙ্গত হইয়া পড়ে। কারণ, সেস্থানে ইহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে পুরুষ, প্রকৃতি এবং তাহার কার্য্য, উভয় হইতেই ভিন্ন ('ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ')। এই আপত্তির উত্তর এই যে যদি পুরুষ ব্যক্ত হইতে ভিন্ন হয়েন, তাহা হইলে তিনি প্রকৃতি হইতেও ভিন্ন, তথাপি অজত্ব প্রভৃতি বিষয়ে প্রকৃতির সদৃশ; সুতরাং, জন্ম প্রভৃতি ব্যক্তের গুণ সম্বন্ধেও কেন তিনি ব্যক্তের সদৃশ হইবেন না? অবশ্য পত্রপাঠ উত্তর হইতে পারে যে, দুই বিরুদ্ধধর্ম্মী গুণ একই অভিন্ন বস্তুতে থাকিতে পারে না। তাহা সত্য নহে। এক অভিন্ন বস্তুর বিরুদ্ধ গুণ থাকিতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে 'বিরুদ্ধ' বলিয়া কোনও কিছু নাই; তাহারা কেবল 'বিভিন্ন' এই কথা বলা যাইতে পারে। পৃথিবীতে সকল বস্তুরই ভিন্ন ভিন্ন স্থান আছে, এবং যখন তাহারা স্ব স্ব স্থানে থাকে তখন তাহারা পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যযুক্ত; তাহারা স্বস্থানচ্যুত হইলেই বিরুদ্ধতা ও অসামঞ্জস্য আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং, আপাত-

বিরুদ্ধ বস্তু যদি স্ব স্ব স্থানে স্থাপিত হয় তাহা হইলে একত্র থাকিলেও পরস্পর বিরুদ্ধ হয় না। (১ম অধ্যায় ১২—খ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং, যদিও প্রকৃতি এক, তথাপি ইহার মধ্যে বহু হইবার শক্তি নিহিত আছে, কারণ অন্যথা উহা কখনও বহুধা বিভক্ত হইতে পারিত না। যদি প্রকৃতি কেবল একই হইত এবং নিজেতেই আবদ্ধ থাকিত তাহা হইলে উহা বহুরূপে প্রকাশিত হইতে পারিত না। সুতরাং প্রকৃতির একত্বের মধ্যেই তাহার বহুত্বের বীজও নিহিত আছে—প্রকৃতি একে বহু। প্রকৃতির অপরাপর গুণের পক্ষেও এই একই কথা। প্রকৃতি একই কালে অজও বটে আবার উৎপত্তিবিশিষ্টাও বটে, নিত্যও বটে অনিত্যও বটে, অসীমও বটে সসীমও বটে, ইত্যাদি। প্রকৃতি যদি কেবলমাত্র অজ, নিত্য, অসীম প্রভৃতি হইত, এবং তাহার মধ্যে যদি জায়মানত্ব, অনিত্যত্ব ও অসীমত্ব প্রভৃতির বীজ নিহিত না থাকিত, তাহা হইলে উহার মধ্য হইতে যাহা কিছু জাত, অনিত্য ও পরিচ্ছিন্ন তাহা উৎপন্ন হইতে পারিত না, সৃষ্টি বা অভিব্যক্তি অসম্ভব হইত। কিন্তু সাংখ্যকার যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া বলেন যে প্রকৃতি বিশুদ্ধভাবে একরূপ নহে; কিন্তু সত্ত্ব, রজ ও তমোরূপ বিভিন্ন উপাদানে সম্মিলিত হইয়া জটিল একরূপ। বস্তুতঃ প্রকৃতিব নিজস্ব বিশেষ গুণ আছে এবং ইহার জন্য সে ব্যক্ত হইতে ভিন্ন; পক্ষান্তরে প্রকৃতি হইতে প্রকৃতিরই অংশরূপে অভিব্যক্ত বস্তুর ধর্ম্ম বা গুণও তাহার আছে, এবং সেই স্থলেই সে ব্যক্তের সদৃশ। এই মতটী সাংখ্যের উপদিষ্ট তথ্যের বিরুদ্ধে নহে, সাংখ্যের কার্য্যকারণবাদ (সৎকার্য্যবাদ) বা অভিব্যক্তিবাদ নিম্নলিখিত প্রকারে এই মতের সমর্থন করিয়াছে; ৯ম কারিকায় বলা হইয়াছে—"অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ। শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎকার্য্যম্" ॥ অর্থাৎ "কার্য্যরূপে পরিণত হইবার পূর্ব্বে কার্য্য কারণকে অবলম্বন করিয়াই অবস্থান করে; কারণ, যাহার অস্তিত্ব নাই তাহা কারণের কোনও চেষ্টাতেই সম্ভূত হইবার নহে। উপাদানসমূহও কার্য্যোপযোগী বুঝিয়া নির্ব্বাচিত হয়; প্রত্যেক বস্তুই প্রত্যেক উপায় দ্বারা সাধ্য নহে; যাহা যে কার্য্যে সমর্থ তাহা সেই কার্য্যই করে এবং কার্য্যও কারণের স্বভাবাপন্ন হয়।" এই শ্লোকটীতে এই বাক্যটী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে—'কারণাভাবাৎ', অর্থাৎ "কারণং যল্লক্ষণং তল্লক্ষণমেব কার্য্যমপি', অর্থাৎ 'কারণের যে লক্ষণ কার্য্যেরও অবিকল সেই লক্ষণই হয় (গৌড়পাদ), অথবা 'কার্য্যস্য কারণাত্মত্বাৎ' অর্থাৎ 'কার্য্য ও কারণ একাত্ম হওয়াতে' (বাচস্পতি)। এখন আমরা এই মতবাদটী যদি প্রকৃতি ও তাহার কার্য্যের প্রতি প্রয়োগ করি, তাহা হইলে আমরা কিরূপে বলিতে পারি যে প্রকৃতি কেবল এক, অনাদি, নিত্য ইত্যাদি, এবং তাহার কার্য্যগুলি কেবলই বহু, উৎপত্তিমান, অনিত্য, ইত্যাদি? যদি কারণ ও কার্য্য একধর্ম্মাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে সাধারণ লক্ষণ বিরাজিত থাকিবে, যদিও অভিব্যক্তির পর কার্য্য নূতনরূপ ধারণ করে এবং কারণ হইতে ভিন্ন অন্য কতকগুলি গুণ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইহাতে একথা বুঝায় না যে এই অপর লক্ষণগুলির বীজ কারণে নিহিত থাকে না, যেহেতু কারণে সেগুলি নিহিত না থাকিলে, কার্য্যে এরূপ কতকগুলি গুণ থাকিবে যাহার কারণ মূল কারণে ছিল না—কিন্তু তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুতে ছিল; অর্থাৎ সরলভাবে বলিতে হয় যে ইহার নিজের কারণের মধ্যে ইহার উপাদান কারণ যথেষ্ট ছিল না, পরন্তু কারণান্তরের প্রয়োজন হইয়াছিল। ব্যক্তের সম্বন্ধে সেই অপর কারণটী কি হইবে? সাংখ্য প্রকৃতি ব্যতীত আর অন্য কোনও কারণ স্বীকার করেন না; সুতরাং প্রকৃতিকেই কেবল যথেষ্ট কারণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে; অর্থাৎ প্রকৃতির ভিতরেই ব্যক্তের সকল গুণের বীজ নিহিত আছে বলিতে হইবে। ইহাতে ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে প্রকৃতির মধ্যে পরস্পর-বিরোধী দুই শ্রেণীর গুণ আছে—এক শ্রেণী প্রকৃতির নিজের স্বাভাবিক (অর্থাৎ অব্যক্ত) অবস্থার এবং অপর শ্রেণী তাহার কার্য্যাবস্থার।

উপরি-উক্ত যুক্তিটী দেখাইতেছে যে একই বস্তুর মধ্যে বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত গুণ থাকিতে পারে এবং বস্তুতঃ জগতে সকল বস্তুরই মধ্যে বিরুদ্ধ গুণ আছে; উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, প্রত্যেক বস্তুই একটীমাত্র অথচ বহু গুণান্বিত—প্রত্যেক বস্তুই একটী সম্পূর্ণ সমষ্টি (A single whole) অথচ বহু অংশের দ্বারা গঠিত; অথবা অন্যভাবে বলা যায় যে প্রত্যেক বস্তুই একের মধ্যে বহু—একরূপ অথচ বৈচিত্র্যময়। পুরুষ সম্বন্ধেও অবিকল এই কথাই সত্য। তিনি এক হইয়াও বহু, অজ হইয়াও জাত, নিত্য হইয়াও অনিত্য, অসীম হইয়াও সসীম ইত্যাদি। তিনি একপুরুষ হইয়াও বহুপুরুষে প্রবিভক্ত; তিনি সকল উৎপন্ন বা কারণবিশিষ্ট কার্য্যের অনাদি কারণ; তিনি নিত্য হইয়া সকল অনিত্য বস্তু বা জীবে তত্তদ্রূপে প্রকাশবান্। তিনি অসীম হইয়া সকল সসীম বস্তু ধারণ করিতেছেন। পুরুষ যদি কেবলমাত্র বিশুদ্ধ এক, যদি কেবল অপ্রবিভেদ্য একরূপই হইতেন, তাহা হইলে বহু হইতে পারিতেন না; তিনি যদি কেবল অজ হইতেন এবং তাঁহাতে উৎপন্ন জগতের কোনও বীজ নিহিত না থাকিত, তাহা হইলে উৎপন্ন যাহা কিছু তাহা হইতে পারিত না; তিনি যদি

কেবল নিত্য শাশ্বত ও অসীম হইতেন এবং তাঁহাতে অনিত্য ও সসীমের কোনও বীজ নিহিত না থাকিত, তাহা হইলে কোনও কিছুই অনিত্য ও সসীম হইতে পারিত না। অথবা অন্যভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, যদিও পুরুষ স্বভাবতঃ ও স্বরূপতঃই এক, অজ, নিত্য, অসীম ইত্যাদি, তথাপি তিনি বহু, জাত, অনিত্য, সসীম ইত্যাদি রূপেও প্রতিভাত হয়েন; এবং 'তদ্বিপরীতস্তথাচ পুমান্' ইহার একটি ব্যাখ্যা আছে, যাহা আমাদিগের এই অনুমানেরই সমর্থন করিয়াছে। ইহার অর্থ হইতে পারে যে পুরুষ তাহাদিগের (ব্যক্ত ও প্রধানের) বিপরীত ও সদৃশও বটে। এই ব্যাখ্যাটীই আমার নিকট সত্য ও নির্দোষ বলিয়া বোধ হয়। এ সম্বন্ধে আমি পরে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। অধ্যাপক উইলসন্ ও ডাঃ কোল্‌ব্রুক্ যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—পুরুষ এই অর্থে এক যে তিনি তাঁহার বহু জন্ম-জন্মান্তরে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি থাকেন—তাহা প্রত্যক্ষতঃই অসম্ভব।

চাষার গান।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল)

বাউল সুর।

ও ভাই, আমরা করি চাষ
ও ভাই, আমরা করি চাষ;
এই হল নিয়ে আর গোধন নিয়ে
সুখেই করি বাস
ও ভাই, আমরা করি চাষ।
সারাবেলা মাঠে মাঠে
রৌদ্রে জলে দিবস কাটে
অনেক দুখে ধরার বুকে
জাগাই অমল হাস।

ও ভাই হল আমাদের বল
ও ভাই হল আমাদের বল
এই হল আমাদের অন্ন জোগায়
পথ্য ও কম্বল।
ও ভাই হল আমাদের বল।
সবুজ ধানে ক্ষেত্র ভরে
আনন্দেতে নেত্র ঝরে
সহজ সুখে দিবস কাটে
মোরা নই যে কারুর দাস,
ও ভাই আমরা করি চাষ॥

শ্রীরামানুজ স্বামী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

শ্রীরঙ্গমে পৌঁছিবামাত্র রামানুজ ও মহাপূর্ণ দেখিলেন যে, একটি সুদীর্ঘ জনস্রোত তাঁহাদিগের দিকে আসিতেছে। এই ব্যাপার দেখিয়া মহাপূর্ণ একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই জনস্রোত কোথা হইতে বা কিজন্য আসিতেছে? পথিক কাতরকণ্ঠে বলিলেন—"হায়, আপনি কি শুনেন নাই যে, আমাদের গুরুদেব যমুনাচার্য্য চির-সমাধিতে মগ্ন হইয়াছেন? আমরা তাঁহার পার্থিব দেহ লইয়া সমাধিক্ষেত্রে গমন করিতেছি।" এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র উভয়েই অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন। রামানুজ শোকে অধিকতর কাতর হইলেন। যাঁহাকে দেখিবার জন্য তিনি সুদূর কাঞ্চী হইতে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহাকে জীবিত দেখিতে পাইলেন না, তাঁহার জীবনের এত আশার একেবারেই মূলচ্ছেদ হইল, ইহাতে যে তিনি এতদূর কাতর হইবেন তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। মহাপূর্ণ বলিলেন—"ইহা ভগবানের কার্য্য, বিলাপ করিলে কি হইবে? ভগবান দয়ানিধান; ইহার মধ্যেও না জানি তাঁহার কত দয়া সঞ্চিত আছে। তিনি যাহা করেন তাহাই মঙ্গল। গুরুদেবের মৃত্যুরও নিশ্চয়ই কোন মঙ্গল উদ্দেশ্য আছে। আসুন, আমরা তাঁহার মৃতদেহ দর্শন করিয়া আসি।"

তৎপরে তাঁহারা সমাধিক্ষেত্রে গমন করিলেন। যমুনাচার্য্যের অন্যান্য শিষ্যগণ মহাপূর্ণকে দেখিয়া যুগপৎ হর্ষ ও দুঃখের সহিত তাঁহারা যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন। মহাপূর্ণও তাঁহাদের সহিত রামানুজকে পরিচিত করিয়া দিলেন। কারণ সকলেই জানিতেন যে, তাঁহাদের গুরুদেব মৃত্যুর পূর্ব্বে এই রামানুজকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন এবং সেই জন্যই মহাপূর্ণকে তিনি কাঞ্চীধামে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

রামানুজ যমুনাচার্য্যের মৃতদেহ দর্শন করিয়া বলিলেন, "আমি নিতান্ত দুর্ভাগ্য নহি; কারণ, যে পার্থিব দেহপিঞ্জর সেই মহাপুরুষকে এতদিন ধারণ করিয়াছিল তাহা এখনও অন্তর্হিত হয় নাই।" ভক্তগণ বলেন যে, এই কথা বলিবার পরই রামানুজ দেখিলেন যে, যমুনাচার্য্যের মৃতদেহের দক্ষিণ হস্তের তিনটি অঙ্গুলি বদ্ধ রহিয়াছে। তখন তিনি সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কি?" শিষ্যগণ বলিলেন—"যখন তিনি জীবিত ছিলেন তখন তো তাঁহার অঙ্গুলি বদ্ধ ছিল না; আমরা ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" রামানুজ বলিলেন, "বোধ হয় তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে কোনরূপ বাসনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে। তিনি যখন শেষ উপদেশ দেন, তখন কি